শ্রীস্বপন কুমার
রূপ-সনাতন

শ্রীস্বপনকুমার

পরিবেশক

চক্রবর্তী এণ্ড কোং
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পরমারাধ্য গুরুদেব
শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই লেখকের

সেই মাধবী রাত (২য় সং)
ফুল পাপিয়া
সোনার ময়ূর
সন্ধ্যারাগ (৩য় সং)
রজনীগন্ধা (৩য় সং)
প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য
ক্ষণ সঙ্গিনী
রহস্যময়ী
রূপসী নগরী
মুক্ত বিহংগ
হৃদয় দেউল
পরমব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য
ঠাকুর নরোত্তম
ইত্যাদি

ROOP SANATAN

A novel based on life sketch and phylosophical episode

by

SRI SWAPAN KUMAR

ভূমিকা
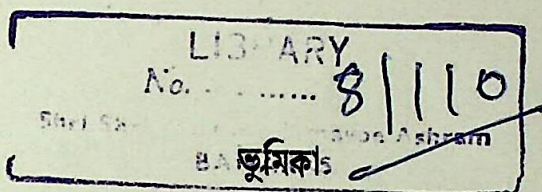
ভগবান এসেছিলেন মর্তে লীলা করতে।

কিন্তু এ শুধু নির্গুণ পরমব্রহ্মের সগুণ প্রকাশেই সীমাবদ্ধ নয়—তার সঙ্গে এসে মিলেছিল হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীমতী রাধিকার অংগকান্তি। 'রাই প্রেম শুদ্ধ করি, রাই কান্তি অংগে ধরি নদে মাঝে করল উদয়।'

অনেক মায়াবাদী বলেন, পরব্রহ্মের আবার প্রকাশ কি?

ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্রহ্ম সংহিতা বলছেন 'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটি স্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্, তদ্ ব্রহ্মম্ নিস্কলং অনন্তং অশেষভূতম্'। কিন্তু সেই অসীম পরমব্রহ্মই যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে লীলায়িত হচ্ছেন স্বগুণ ব্রহ্মে—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে।

প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু শুধু একাই পৃথিবীতে আসেন নি—তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন মহাবিষ্ণু অবতার মহাদেবস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু। এসেছিলেন শেষশায়ী সংকর্ষণ অবতারী নারায়ণ' যাঁর অংশকলা সেই বলরামরূপী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। এসেছিলেন ব্রহ্মার অবতার ঠাকুর হরিদাস—আর এসেছিলেন ব্রজের নবমঞ্জরীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি রূপ-সনাতন। গোলোকবিহারীর সে অপূর্ব লীলামাধুরী বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। অধম মানুষের সাধ্য কি, সেই পরম মাধুর্যপূর্ণ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগ্রাহ্য বিষয়বস্তুর বর্ণনা করে?

দীনাতিদীন লেখক আমি, সুদূর ধরণীপ্রান্তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটাণু। তাই আমার সাধ্য কি সেই অনন্ত, অসীম, নির্গুণ পরব্রহ্মের সগুণ লীলার বর্ণনা করি।

তবে জ্ঞানে যাকে পাওয়া না, তাকে পাওয়া যায় প্রেমে। চিনতে না পারি, বুঝতে না পারি, ভালবাসতে পারি তাঁকে। বলতে পারি, ওগো আমি যে তোমারই অংশ। ছোট হই, নগণ্য হই তবু তোমার। তোমার নিত্যলীলায় প্রবেশের অধিকার দাও আমাকে। তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী। তুমি লেখক, আমি শুধু তা প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। আমাকে তুমি ঠিক পথে চালিয়ে বলবার শক্তি দাও প্রভু।

আর সবার চেয়ে আমার বড়ো শক্তি সেই পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের পবিত্র স্মৃতি। সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদকে যাঁর মধ্যে সগুণরূপে দেখে ধন্য হয়েছি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করে আমার রচনা হচ্ছে সুরু।

যাঁর কৃপায় অজ্ঞান পায় জ্ঞান, অন্ধ পায় চক্ষু, মুর্খ পায় বিদ্যা সেই নামী-প্রেমী অবতার শ্রীগুরুদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই দীন রচনা উপহার দিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।

শাস্ত্রে আছে 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ—সেই পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের পবিত্র স্মৃতি স্মরণে এনে আমার এই রচনা। ভক্তিময় অন্তরঙ্গতার সুরে আমার এই লীলা বর্ণনা। যাঁর উদ্দেশ্যে যাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে ধন্য হয়ে আমি এ রচনায় ব্রতী, তিনি যদি দীন লেখকের এই উপচার গ্রহণ করেন তবেই আমি ধন্য ও কৃতার্থ। আমার জীবন ও জন্ম সফল।

কিন্তু আমার পূজার উপকরণ অতি সামান্য। সামান্য হলেও আশা রাখি শ্রীগুরু বৈষ্ণবেরা আমার উদ্দেশ্য বুঝে আমায় ক্ষমা করবেন। মহাপ্রভুর ভাষায়—

'মূর্খ' বলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বলে ধীর
দুই বাক্য পরিগ্রহ করেন কৃষ্ণবীর।
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ
ভক্তের বর্ণনামাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

রূপ-সনাতনের বাল্য, কৈশোর থেকে মহাপ্রস্থান পর্যন্ত জীবন উপন্যাসের বর্ণনার সবচেয়ে প্রধান অংশ জুড়ে আছেন গৌড়ের হোসেন শাহ বাদশাহের কাহিনী আর তার সঙ্গে পরম করুণাঘন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পবিত্র জীবনলীলা। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার জীবনযাত্রার এক অপরূপ ছবি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীগোস্বামীদের সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, সবটুকুই এই জীবন উপন্যাসের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি। দীর্ঘদিন ধরে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ করে এই সব উপকরণ সংগ্রহ করেছি। স্থান কাল পাত্র সব সময়ই সঠিকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে—কোথাও কাল্পনিক কোন কিছুর সাহায্য নেওয়া হয়নি।

এখন সাধুহৃদয় সজ্জনগণ ও বৈষ্ণবপাঠকমণ্ডলী যদি বইটি পড়ে তৃপ্ত হন তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

বিনীত—
গ্রন্থকার
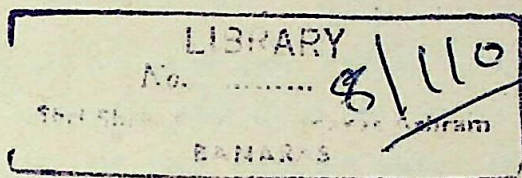
॥ এক ॥

গঙ্গার উপকূলে শান্তিপুর।

আগে গ্রামের নিচেই বয়ে যেতো পুণ্যতোয়া জাহ্নবী—এখন নদী একটু দূরে সরে গেছে।

গঙ্গার ধারেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহ। গৃহপ্রাঙ্গণে কয়েকজন ভক্তসহ আচার্য উপবিষ্ট। তাঁর চার পাশে বসে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত-বৃন্দ—শ্রীনিবাস, গঙ্গাধর, শুক্লাম্বর ইত্যাদি।

আকাশের দিকে চেয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে শ্রীঅদ্বৈত বলে চলেন—তুমিই তো বলেছিলে প্রভু যখন ধর্মের গ্লানি সমুপস্থিত হবে, অধর্মের অভ্যুত্থান হবে তখনই হবে তোমার পবিত্র চরণপাত। তখন তুমি ধরণীর প্রান্তে আবির্ভূত হবে সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে, দুষ্কৃত-কারীদের বিনাশের জন্যে।

কিন্তু কই, আজও ত তুমি এলে না। আমি যে নিরন্তর তোমারই আশায় তিল-তুলসী হাতে পবিত্র গঙ্গোদক স্পর্শ করে তোমার ভজনায় রত। তুমি দেখা দাও গোলোকবিহারী—তোমার সাধের পৃথিবীকে এই অধর্মের নাগপাশ থেকে তুমি মুক্ত করো!

শুক্লাম্বর ধীরকণ্ঠে বললেন—আচ্ছা, ধর্মের গ্লানি কি সত্যিই পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত হয়েছে?

গঙ্গাধর একটু দুঃখপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—গ্লানির আর বাকী কি আছে? সমাজ গেছে, আশ্রম গেছে, ধর্মাচরণ গেছে—আছে শুধু নৃত্য গীত আর বাদ্য কোলাহল। ধর্মের নামে যা চলছে তাও অধর্ম।

স্বার্থান্বেষীর ইচ্ছায় চলছে সবকিছু। আমরা কয়েকজন শুধু ধর্মের একটা কংকাল নিয়ে বসে আছি মাত্র।

শ্রীনিবাস বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ গঙ্গাধর, আজকের জগতে যে দিকেই চোখ মেলি শুধু দেখি প্রতিটি মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে স্বার্থের নেশায় মত্ত। একজন অন্য জনকে বঞ্চনা করে অর্থ আর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে দিনরাত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে চলেছে। পাণ্ডিত্যের অহমিকায় উন্মত্ত হয়ে একদল কপিল-জৈমিনীর পতাকা হাতে নিয়ে কেবল তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় ছুটোছুটি করছেন। দৃপ্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বেদান্তকে বিকৃত করেছেন। ভগবানের বিগ্রহ দূরে নিক্ষেপ করে তাঁরা প্রেমময় ভগবানকে পর্যন্ত বিকৃতরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি বিভিন্ন মত এসে জনসাধারণের চিত্ত নিয়ে নানা পথে টানাটানি করছে। কত ভণ্ড প্রতারক সাধুর বেশ ধরে কামিনী কাঞ্চন সংগ্রহের নেশায় মেতে উঠেছে। কত লোক তপস্বীর সাজ গ্রহণ করে সরল মানুষদের বঞ্চনা করে তপস্বী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ওপর ঘৃণা সঞ্চারিত করছে। আর গৃহস্থদের মধ্যে ত শুধু হিংসা দ্বেষ, পরনিন্দা, আর উদর চিন্তা।

শুক্লাম্বর অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, চুপ কর শ্রীনিবাস, এসব কথা আর শুনতে পারছি না।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য আবার ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন—এসো এসো গোবিন্দ, তোমার সন্তানদের এই ঘোর দুর্দিনে তুমি তাদের রক্ষা না করলে রক্ষা করবার যে আর কেউ নেই প্রভু!

একজন বৈষ্ণব বলেন—তুমি কি সত্যিই মনে কর আচার্য, স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হবেন এই ধূলিমলিন, লোভ, লালসা, হিংসা আর ঈর্ষায় জর্জর আজকের এই পৃথিবীতে?

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ভাববিভোর কণ্ঠে বলেন—আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এমনি দিনে তাঁর আবির্ভাব অনিবার্য। যুগে যুগে যে এমনি

ক্ষণেই হয়েছে তাঁর আবির্ভাব। ওগো, আমি যে আকাশে বাতাসে তোমার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, দিকে দিকে দেখতে পাচ্ছি তোমার আবির্ভাবের শুভ সূচনা। তুমি এসো, দেখা দাও হে প্রভু—

শ্রীনিবাস বলেন—তিনি স্বয়ং দেহধারণ করে আমাদের মধ্যে আসবেন এমন দিন কি হবে?

শুক্লাম্বর বলেন—আমি যেন ততদিন বেঁচে থাকতে পারি ভগবান, এই পরম সৌভাগ্য থেকে আমায় বঞ্চিত করো না ঠাকুর। আমি মৃত্যুর আগে যেন তোমায় দেখে যেতে পারি।

গঙ্গাধর বলেন—আমার মত পাপিষ্ঠ তোমায় পাছে দর্শন করে এই ভয়ে যদি তুমি না আস ঠাকুর, তবে আমায় বলো, আমি এক্ষুণি এই পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর জলে দেহ বিসর্জন দিই। তবু তুমি এসো ঠাকুর—

একজন ভক্ত প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এ সবই আচার্যের কল্পনা-বিলাস নয় ত?

অদ্বৈতাচার্য দৃঢ়স্বরে বলেন—একে তুমি কল্পনা বলছ ব্রহ্মচারী? তোমার তারকেশ্বরের তীর্থ প্রতিষ্ঠা কল্পনা হতে পারে, পুরান শাস্ত্র কল্পনা হতে পারে, কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীমুখে যা বলেছেন তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

শুক্লাম্বর বলেন—স্বীকার করলাম ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রতিকার কি? ভগবান পৃথিবীতে এসে কি করবেন?

আচার্য বলেন—যুগে যুগে যেমন এক ধরনের গ্লানি উপস্থিত হয় না, তেমনি একভাবে তার প্রতিকারও হয় না। দয়াময় প্রভু এবার অস্ত্র হাতে শাসন করতে আসছেন না, তিনি আসছেন প্রেম আর ভালবাসা বিলোতে। কিভাবে ধর্ম আচরণ করতে হয় তা জীবকে শিক্ষা দিতে। এস ভাই, আমরা সবাই মিলে তাঁকে ডাকি। তিনি দয়াময়—করুণানিধান। তিনি কখনও এতগুলি

ভক্তের সম্মিলিত ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না। চিরদিনই তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, আজও দেবেন।

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে শ্রীঅদ্বৈত গান ধরেন। অপূর্ব সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—

ভজ শ্রীকৃষ্ণ, কহ শ্রীকৃষ্ণ, লহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে,
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

ধীরে ধীরে সংগীত ঝংকার উচ্চ গ্রামে ওঠে। সংগীত লহরী আকাশ পৃথিবী পরিপ্লাবিত করে সকাতর প্রার্থনা নিয়ে যেন কোন সুদূরের পানে ছুটে যায়।

যাঁরা আহ্বান করছিলেন তাঁরা যুক্তকর, গলদশ্রু, ভক্তিবিহ্বল।

আচার্য অনুভব করলেন, পৃথিবী ব্যোম স্তব্ধ হয়েছে। একটা অসীম, অব্যক্ত শক্তি যেন তাঁকে বেষ্টন করেছে। এক সুমহান, অপূর্ব জ্যোতি যেন আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পূর্ণ করে ফুটে উঠছে। দিক-তট আচ্ছন্ন করে সে জ্যোতি যেন পৃথিবীর পানে ছুটে আসছে।

আচার্যের প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত কণ্টকিত হলো। তিনি আবেগে কেঁপে উঠলেন। অশ্রুরাশি অবিরল ধারায় নেমে এসে তাঁর বক্ষকে সিক্ত করে তুললো।

সংগীত ঝংকার মিলিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব কোত্থেকে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে আচার্যের চরণে পড়লেন। বললেন— রক্ষা কর আচার্য, আমাদের ধর্ম আর বুঝি থাকে না। আপনার উপদেশ মত আমরা ঘরে বসে শ্রীকৃষ্ণনাম করছিলাম, প্রতিবেশীরা সহ্য করতে না পেরে আমাদের এসে প্রহার করেছে।

মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বেশবাস বিস্রস্ত, দেহ তেজোদ্দীপ্ত, দুটি চোখে অনলবর্ষী দৃষ্টি। সহসা তিনি কোন কথা বলতে পারেন না।

শুক্লাম্বর করুণকণ্ঠে বলেন—হা কৃষ্ণ, তুমি বুঝি আর এ পাপ ধরায় এলে না!

আচার্য অপরিসীম ক্ষোভে হুংকার দিয়ে ওঠেন। সে হুংকারে চারিদিক কেঁপে ওঠে। পুণ্যতোয়া ভাগিরথী যেন যে হুংকার তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে নিয়ে যায়। আকাশ পৃথিবী ছেড়ে সে হুংকার যেন অনেক ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। তিনি বলেন—

'শুন শ্রীনিবাস, গঙ্গাধর, শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনি আসিয়া,
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লইয়া॥
যদি নাহি পারি তবে এই দেহ হইতে।
প্রকাশিয়া চারিভূজ চক্র লইনু হাতে॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধনাশ,
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুই তাঁর দাস॥'*

---

*শ্রীচৈতন্যভাগবত

॥ দুই ॥

তারপর কেটে গেছে সুদীর্ঘ ষোলটি বছর। ভৈরব নদের তীরে প্রেমভাগ গ্রাম।

চারশো বছর আগে ভৈরব নদ যেখান দিয়ে বয়ে যেত আজ আর সেখান দিয়ে বয়ে যায় না—এখন নদ অনেক দূরে সরে গেছে।

গ্রামটি ছিল বড় সুন্দর। বড় বড় গাছগুলি পত্র পুষ্প শোভিত—সবুজিমায়া ভরা ধানের ক্ষেত, সমুন্নত সুন্দর কুটির শ্রেণী, বড় চিত্তাকর্ষক।

এই গ্রামের অধীশ্বর ছিলেন বিতাড়িত কর্ণাটরাজ রূপেশ্বরের বংশধর কুমারনাথ। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ তাঁরা। কুমারের তিন ছেলে, এক মেয়ে।

বড় ছেলে অমরনাথ নবদ্বীপের বিখ্যাত আচার্য বাসুদেব সার্বভৌমের ভাই রত্নাকার বিদ্যাবাচস্পতির কাছ থেকে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে ঘরে ফিরেছেন।

আর সেই সঙ্গে বাবাকে লুকিয়ে তিনি ফারসী ভাষাও শিখেছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি সব পাঠ শেষ করে ঘরে ফিরেছেন—অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় ছেলে ন বছর বয়সের সন্তোষকুমার টোলে যাননি।

অমরনাথ যখন মাঝে মাঝে গৃহে ফিরতেন তিনিই সন্তোষকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতেন। এবারে গৃহে এসে তিনি ভালভাবে সন্তোষের পড়াশুনোর ভার নিলেন।

সন্তোষকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। আর সন্তোষও একবার যা শোনেন সারা জীবনে তা আর ভোলেন না।

কনিষ্ঠ অনুপের বয়স ছ বছর—সে সন্তোষের কাছ থেকেই পাঠ গ্রহণ করত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

ভৈরবের উপকূলে বসে কথা বলছিলেন দুই ভাই—অমর আর সন্তোষ। এই দুই ভাইই একদিন সনাতন আর রূপ গোস্বামী নামে সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সন্তোষের ধারণা ছিল, দাদার মত রূপবান, শক্তিশালী, মেধাবী আর বিদ্বান বোধ হয় আর কেউ নেই। সে তাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা দাদা, পড়ুয়াদের মধ্যে তোমার মত পণ্ডিত আব কেউ আছে?

অমর হেসে উত্তর দেন—আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত নবদ্বীপে অনেক আছেন ভাই।

অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে সন্তোষ বলে—ইস্, তা আর হয় না। বাবা বলেছেন—তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

অমর হেসে বললেন—আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি, কিন্তু সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন এমন অনেক পণ্ডিত নবদ্বীপে আছেন।

—আচ্ছা, তুমি একে একে তাঁদের নাম বল দেখি দাদা—আমি চিন্তা করে দেখব, সত্যি কে তোমার চেয়ে বড়।

—কত নাম বলব ভাই। পণ্ডিত মুরারী গুপ্ত আর তাঁর ভাই মুকুন্দ আছেন। আছেন পণ্ডিত গদাধর। আর আছেন ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনাথ। কয়েকখানা গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন —তেমন গ্রন্থ রচনা করা আমার পাণ্ডিত্যে কুলোবে না। কিন্তু এঁদের সবার চেয়ে বড় পণ্ডিত আছেন একজন। তাঁর বয়েস

মাত্র ষোলো, কিন্তু তেমন প্রতিভাবান বালক বোধহয় সারা পৃথিবীতে কখনও জন্মায়নি।

—তাঁর নাম কি দাদা?

লোকে তাঁকে নিমাই পণ্ডিত বলে ডাকে—ভাল নাম বিশ্বম্ভর। এমন অদ্ভুত বালক সারা নবদ্বীপে কেউ কখনও দেখেনি। এই বয়সেই তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিত আর সার্বভৌমের টোলে ব্যাকরণ ন্যায় ইত্যাদির পাঠ শেষ করে নিজেই একটি টোল খুলেছেন

—তাঁর টোলে পড়ুয়া হয়েছে?

—অনেক—অনেক। তাঁর টোলে পাঠগ্রহণ করাকে পড়ুয়ারা মহাভাগ্য বলে মনে করে। আমারই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—

—কি ইচ্ছে হয় দাদা?

—তাঁর পড়ুয়া হতে। তাঁর অতুল পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁর পাঠ নিতে যেমন সাধ হয়, তেমনি ইচ্ছে করে তাঁর অতুলনীয় সুন্দর মুখখানি দিনরাত দেখতে।

—তিনি কি এতই সুন্দর?

—তিনি যে কত সুন্দর, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ভাই। তিনি সব বিষয়ে সবার চেয়ে সেরা। প্রতিভায়, সৌন্দর্যে বিদ্যায়, তর্কে তাঁর সমান নবদ্বীপে আর কেউ নেই—বোধহয় সারা জগতেও নেই।

—আচ্ছা দাদা আমি একবার নবদ্বীপ যাই না কেন?

—যদি তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় ত যাও—তবে আমি ত যেতে পারব না। দুএক দিনের মধ্যেই আমাকে গৌড়ে যেতে হবে নবাব দরবারে চাকরী পাবার সুযোগ এসেছে। মানুষ হয়ে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তবেই দেশে ফিরব, তা না হলে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না ভাই।

—আমি যে তোমাকে ছেড়ে—

—বুঝেছি। আমারই কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে ভাল লাগবে! কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা কর—আমি শিগ্‌গীরই তোমাকে গৌড়ে নিয়ে যাব। আমি মানুষ হতে চাই ভাই—চাই এমন কীর্তি রাখতে, যা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ কোনদিন ভুলবে না।

॥ তিন ॥

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বুঢ়ন গ্রাম।

এই গ্রামেই বাস করতেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণের স্ত্রীর নাম উজ্জ্বলা। শিশু পুত্রের নাম হরিদাস।

হরিদাসের বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখনই তাঁর বাবা মা মারা গেলেন। অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন বালককে আশ্রয় দিলেন এক প্রতিবেশী। প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই মুসলমান—কাজেই যাঁর গৃহে হরিদাসকে আশ্রয় নিতে হলো তিনিও ছিলেন মুসলমান। মুসলমানের গৃহে হরিদাস মুসলমানের মতই মানুষ হতে লাগলেন।

হরিদাসকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হলো। হরিদাসকে আল্লা নাম শেখাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা হোল, কিন্তু হরিদাস শুধু বলতে লাগলেন হরি, হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। হরিদাসকে কোরাণ পড়তে দেওয়া হলো, তিনি পড়লেন রামায়ণ। হরিদাস নমাজ পড়তে চান না—সেই সময় লুকিয়ে ভাগবত পড়েন। সবার সামনে চীৎকার করে ওঠেন—কোথায় আমার দয়াল হরি। প্রচুর লাঞ্ছনা ভৎসনা দ্বারাও হরিদাসের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন

আনা সম্ভব হলো না। অবশেষে সুরু হলো পীড়ন, অত্যাচার। তবু হরিদাস অচল, অটল। অবশেষে বিশ বছর বয়সে তিনি একদিন গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

বেনাপোলের জঙ্গলে এসে হরিদাস একটি কুটির নির্মাণ করলেন। তার পাশেই ভক্তিরোপিত, অশ্রুসিঞ্চিত তুলসী মঞ্চ। হরিদাসের সঙ্গী তুলসী, পাঠ হরিগুণগান, কাজ হরিনাম জপ। তিনি মানুষকে চান না—কিন্তু মানুষ তাঁকে ছাড়ে না। অনেক ভক্ত এসে জুটে গেল। তাঁরা মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়—নানাবিধ উপচার ভক্তিভরে বয়ে নিয়ে আসে গৃহ থেকে হরিদাসের জন্যে।

হরিদাসের কুটির থেকে কিছু দূরেই থাকতেন জমিদার রামচন্দ্র খাঁ। তিনি হিন্দু হলেও মুসলমানের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রাহ্মণ হয়েও ছিলেন চূড়ান্ত অসদাচারী। তিনি যখন দেখলেন, একজন যবন তাঁর এলাকায় জনসাধারণের ভক্তি প্রীতি আহরণ করছে তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পবিত্র হরিনাম ধ্বনিতে স্থাবর-জঙ্গম মধুময় হয়ে উঠেছে এটা কি করে রামচন্দ্র খাঁর মত লোক সহ্য করেন? তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। যেমন করে হোক লোকটিকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে তাঁর সম্মান থাকে না।

তাই একদিন হরিদাসের কুটিরে আগুন লাগিয়ে দিলেন তিনি। হরিদাস তখন হরিনাম গানে এতই বিভোর যে তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। কিন্তু রামচন্দ্র খাঁর শত শত প্রজারা ছুটে এসে আগুন নিবিয়ে দিল।

শুধু তাই নয়, পরদিন তারা হরিদাসের জন্যে বড় একখানা ঘর তুলে দিল। রামচন্দ্রের সামান্য ক্ষোভ এবার চূড়ান্ত ক্রোধ বহ্নিতে পরিণত হলো।

রমেচন্দ্র খাঁর অনেক হাতী ছিল। তিনি হস্তী রক্ষকদের,

উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে, হরিদাসকে হত্যা করতে পাঠালেন। হরিদাস একদিন দুপুরে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন এমন সময় হাতীর দল এসে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল। হরিদাস পিছু হটলেন না—তিনি যুক্তকরে, মুদিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। দেখতে দেখতে সবচেয়ে বৃহৎ হাতীটি মাটিতে বসে পড়ল। অন্য হাতীগুলি ধীরে ধীরে ফিরে চলে গেল।

কিছুতেই হরিদাসকে জব্দ করতে না পেরে রামচন্দ্র খাঁ হরিদাসের ধর্ম নষ্ট করবেন স্থির করলেন। চরিত্রহীন রামচন্দ্র খাঁর একটি সুন্দরী বিলাসিনী রক্ষিতা ছিল—তার নাম লক্ষহীরা।

হীরা শুধু নামেই হীরা নয়, রূপেও সে ছিল অনন্যা। আর তার গর্বও তাই ছিল অপরীসীম। তা ছাড়া দেশের অধিপতি যার চরণে অবনত তার গর্ব থকেবে নাই বা কেন? রাজপ্রাসাদের কিছু দূরে হীরার বিরাট অট্টালিকা। রামচন্দ্র খাঁ রোজ ময়ুরপঙ্খী নৌকায় চড়ে খাল বেয়ে হীরার প্রাসাদে যান।

গর্বভরে হীরা রামচন্দ্র খাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বসল যে সে হরিদাসের ধর্ম নষ্ট করবে।

নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে সন্ধ্যাবেলা হীরা হরিদাসের কুটিরে এসে দর্শন দিল।

হরিদাস তখন জপে নিবিষ্ট চিত্ত।

মৃদুস্বরে তিনি জপ করতেন না—উচ্চকণ্ঠে ধীর গতিতে জপ করতেন তিনি। নিজের নাম গান শুনে নিজেই পবিত্র হতেন, আর পশুপক্ষী, স্থাবর জঙ্গম, বৃক্ষলতা যে কেউ কাছে থাকত তাকেই তিনি সুমিষ্ট নাম শুনিয়ে তৃপ্ত করতে।

তিনি জপ করছিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে।

অদূরে বসে হীরা শুনতে লাগল। হরিদাসের দুচোখ অশ্রুপূর্ণ, তিনি হীরাকে দেখতে পেলেন না।

হীরা অগত্যা অলঙ্কারের শিঞ্জনে নিজের উপস্থিতি জানাল। কিন্তু হরিনামের মধ্যে তিনি এমনিই নিবিষ্টচিত্ত যে সে শব্দ তাঁর কানে গেল না।

হরিদাসের মন আকর্ষণ করবার জন্যে হীরা হরিদাসের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে হাত শূন্য হতেই ফিরে এলো—কি এক দুর্নিবার অদৃশ্য শক্তি যেন সে হাতকে সজোরে দূরে ঠেলে দিল। হরিদাসকে স্পর্শ করতে পারল না হীরা।

ব্যর্থ হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর আবার চেষ্টা করল। তার গর্বিত চঞ্চল মন কিছুতেই স্থির থাকতে পারল না। খোঁপা থেকে একটা ফুল নিয়ে হীরা সেটা ছুঁড়ে মারল হরিদাসের দিকে।

হরিদাসের সমাধি ভেঙে গেল। চোখ মুছে ধীরে ধীরে হীরার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন হরিদাস।

হীরা তার শাণিত অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করল—চটুল কটাক্ষ, মৃদু হাসি, নুপুর নিক্বণ, অলস ভঙ্গিমা, উদ্ধত যৌবনলাস্য। হীরার মনোভাব বুঝতে পারলেন হরিদাস। বললেন—আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি জপটুকু শেষ করে নিই।

হীরা অপেক্ষা করতে লাগল। রাত গভীর হলো—তবু জপের বিরাম নেই। অবশেষে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে। ঘুম যখন ভাঙল, হীরা দেখল, পূব আকাশ রক্তাভায় পূর্ণ। বিহগের কল কাকলি ঘোষণা করছে ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

হরিদাস তখনও জপ করে চলেছেন অবিরাম।

এইভাবে পরাজিত হয়ে লজ্জায় অধোবদন হীরা গৃহে ফিরে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় আবার এলো সে। হরিদাস তখন সবেমাত্র জপ সুরু করেছেন। হীরা কাছেই ভূমির আসনে বসল। সে গান ধরবার

উপক্রম করছিল, কিন্তু তার আগেই হরিদাস বললেন—কাল আপনাকে বড় কষ্ট দিয়েছি। আজ আমি শিগগীরই জপ শেষ করে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

একথা শুনে হীরা চুপ করে বসে রইল।

হরিদাস তখন গান ধরলেন।

যে অপূর্ব সংগীত বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ কখনও গায়নি। মানুষের কণ্ঠ যে এত মধুময় হতে পারে তা না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন।

রাত যত বাড়তে লাগল. ততই বাড়তে লাগল সংগীত-উচ্ছ্বাস। স্থাবর জঙ্গম যেন উৎকর্ণ হয়ে সে গান শুনতে লাগল। নদী যেন সে গান শুমে তার কলগান বন্ধ করে উথলে উঠল।

গভীর নিশি—বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত।

হীরা শুধু পরম বিস্ময়ে দেখল, হরিদাসের বুক বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এসে তার দেহকে সিক্ত করছে। দেহ তার উচ্ছাসে আন্দোলিত। কণ্ঠ আবেগে কম্পিত। মস্তকের কেশরাশি চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

এক অদৃশ্য শক্তি যেন তার কণ্ঠকে ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর করে তুলল। একটা অপূর্ব জ্যোতি যেন হরিদাসকে বেষ্টন করে ফুটে উঠল।

শুনতে শুনতে হীরা ভাবল, এ ত জপ নয়, এ যে সংগীত। তারপর ভাবল, এ ত সংগীত নয়, এ যে স্তব। এত মিষ্ট নাম ত সে কখনও শোনেনি। এত মধুর ঝংকার জীবনে কখনও কানে যায়নি। হীরারও ইচ্ছা হল সে নাম করে—ভগবানকে ডাকে। কিন্তু তারপর ভাবল, সে কেন ডাকবে ভগবানকে ? কিসের অভাব তার ? কিসের দৈন্য ?

তবে সে নাম গান ছেড়ে উঠতে পারল না হীরা। নাম যত শোনে ততই শুনতে ইচ্ছা হয়।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে যায়।

হীরা স্তব্ধ হয়ে নাম শুনতে থাকে।

শুনতে শুনতে তার প্রাণের ভেতর যেন একটা কান্নার রোল ওঠে। কেমন যেন একটা অদম্য বাসনা জাগে তার চীৎকার করে ওঠবার জন্যে। হীরা কেঁপে ওঠে। চোখে তার অশ্রু—তবে কেন এ অশ্রু তা সে জানে না। হৃদয়ের ভেতর একটা করুণ হাহাকার—তবে তার কারণ কি তা সে বোঝে না। মহামূল্যবান বসন পরিহিতা লক্ষহীরা ধূলোয় লুটিয়ে কাঁদে।

তারপর উঠে বসে নাম করতে সুরু করে হীরা। হরিদাসের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরে।

ধীরে ধীরে হরিদাসের সমাধি ভাঙে।

চোখ মেলে তাকান তিনি।

যে চোখে চোখ পড়তেই হীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়। একটা অকারণ লজ্জা এসে আচ্ছন্ন করে তাকে।

হীরা উঠে দাঁড়ায়। তারপর দ্রুত পায়ে প্রস্থান করে।

* * * *

পরদিন সন্ধ্যা।

সারাদিন উপবাসী হীরা হাতমুখ প্রক্ষালন করে সামান্য বস্ত্র পরিধান করে হরিনাম গাইতে গাইতে চলেছিল হরিদাসের কুটির পানে

পথরোধ করলেন রামচন্দ্র খাঁ। প্রশ্ন করলেন—হীরা এই মলিন বেশে কি তুমি হরিদাসকে ভোলাতে চলেছ ?

হীরা উত্তর দেয়—কাঙালের কাছে ভাল কাঙালের বেশ।

—আর হরিনাম গান ?

—এটাও ঠিক—হরিভক্তকে হরিনামে ভোলাতে হয়।

—আর বিমর্ষ বদন ?

—হাসিকে তুলে রেখেছি শুধু তোমার জন্যে।

—কিন্তু মনে রেখো আজই শেষ দিন।

—মনে আছে।

ধীর পায়ে হীরা হরিদাসের কুঠিরের দিকে চলে। কুটিরের বাইরে তুলসীতলে প্রণাম করে ভেতরে প্রবেশ করে দেখে হরিদাস আগের মতই নামে উন্মত্ত। নিজে মেতে উঠে শ্রোতাকেও মাতাল করছেন পবিত্র নাম গান দিয়ে। হীরা দ্বার প্রান্তে বসে পড়ে।

নাম চলে উচ্চরোলে। কণ্ঠ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়। সংগীত মূর্ছনা যেন পৃথিবী মুগ্ধ করে আকাশের দিকে ছুটে যায়। মুগ্ধচিত্তে আত্মহারা হয়ে হীরা নাম শুনতে থাকে। যত শোনে ততই তার দেহ মন অবশ হয়ে যায়। চক্ষুর অশ্রুরাশি বসন ভিজিয়ে পৃথিবীকেও সিক্ত করে তোলে। হৃদয়ের তারে তারে ওঠে নামের ঝংকার। আপনি সে নাম জপ করতে থাকে। সে জপের গতিরোধ করা তার সাধ্যাতীত। যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি তার কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। ধূলিধূসরিতা সুন্দরী হীরা যেন নিজেকে হারিয়ে এক অভিনব নূতনত্বে মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে হরিদাস নাম শেষ করে দেখেন রোরুদ্যমানা হীরা দ্বারে বসে আছে। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—বাইরে কেন মা, ভেতরে এসো।

হরিদাসের মধুর মাতৃসম্বোধন যেন হীরার অনুতাপের জ্বালাকে স্নিগ্ধ দুস্প্রাপ্য চন্দনের প্রলেপে অনুলিপ্ত করে। হরিনাম জলে স্নান করে হীরা যেন নিজেকে পরম পবিত্রা বলে মনে করে।

স্নেহভরে হরিদাস বলেন—তোমাকে দুদিন কষ্ট দিয়েছি মা, আজ তোমার সঙ্গে কথা বলব। বসো। বল তোমার কি বক্তব্য ?

হরিদাসের দেব-বাঞ্ছিত চরণে লুটিয়ে পড়ে হীরা। তারপর সেই পবিত্র চরণ স্পর্শে শিউরে ওঠে। যেন একটা প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি তার সারা দেহে সঞ্চালিত হয়েছে। চমকে উঠে হীরা বলে—একি…

হীরার মাথায় হাত দিয়ে হরিদাস বলেন—ও মা।

—আমায় রক্ষা কর বাবা। আমি যে…

—তোমার কিছু অপরাধ নেই মা। তোমার পাপ ক্ষয় হয়েছে। এখন তুমি অতি পবিত্র।

—বুঝেছি বাবা, এ পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করার জন্যই এদেশে এসেছ তুমি। কিন্তু আমার কি গতি হবে বাবা?

—কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রকে আশ্রয় কর মা···সব জ্বালা দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু এত মধুর স্বরে হরিনাম করতে ত কাউকে দেখিনি বাবা। এ নামেতে আমায় পাগল করে তুলেছে।

—এখন তবে আমি চলি মা। আমার যে অনেক কাজ।

—কোথায় বাবা?

—সারা ভারত ব্যাপী।

—কিন্তু আমার একটা উপায় না করে গেলে, আমি যে আবার ডুবে মরব।

—আর ভয় নেই মা। এই নামই তোমায় রক্ষা করবে।

—আমি কি নিয়ে থাকবো বাবা?

—এই নাম নিয়ে থাকবে। যখন কর্ম শেষ হবে শ্রীকৃষ্ণেতে চলে যাবে। তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হবে তোমার আশ্রয়। সময় হলেই কৃষ্ণ তোমায় ডেকে নেবেন।

'তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল,
গৃহবিত্ত যাহা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা যে ঘরে,
রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম জপ করে'। —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

চার

প্রজাবৎসল বিচক্ষণ সুলতান হোসেন শাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে।

একদিন তিনি নগর ভ্রমণে বের হবার উদ্যোগ করলেন।

প্রাসাদের সামনে প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত অশ্ব। শরীর রক্ষী সৈন্যরাও সব প্রস্তুত।

সুলতান তাঁর প্রিয় উজীর গোপীনাথকে (নবাব দত্ত নাম পুরন্দর খাঁ) প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা গোপীনাথ বলত, ভাল ভাল ঘোড়াগুলো এদেশে এসে কেন বিগড়ে যায়? তারা খায় দায় প্রচুর, তবে তাদের সে তেজ আর থাকে না।

গোপীনাথের পিছনে মন্ত্রী কেশব ছত্রী। তার পেছনে কয়েক-জন রাজকর্মচারী। সবার পেছনে অমর আর সন্তোষ।

কেউ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। অবশেষে অমর বললেন—জাহাপনা, এদেশের ঘাস ঘোড়াকে দর্ব্বল করে।

—কেন?

—এদেশের ঘাসে জলের ভাগ বেশী। এতে মেদ বাড়ে, কিন্তু শক্তিকে কমিয়ে দেয়।

—তুমি কি শুকনো ঘাস দিতে বল?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। পাহাড়ে বা কঙ্করময় প্রদেশে যে সব ঘাস জন্মায়, সে সব ঘাসে জলের ভাগ কম। তাতে মেদ বাড়ে না, কিন্তু তেজ বাড়ে।

—তুমি কে যুবক ?

—জাঁহাপনার সামান্য ভৃত্য।

—বেশ, তোমাকে আমি অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলাম। কেশবজী, আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে।

হোসেন শাহ একদিন তাঁর কর্মচারীদের বললেন—আগামী কাল আমি শিকারে যাব, যারা বাঘ দেখে ভয় পাবে না, তারা আমার সঙ্গে চলো।

বৃদ্ধ গোপীনাথ সহাস্যে উত্তর দিলেন—জাঁহাপনা ছাড়া আর কাউকে কখন ভয় করিনি, এখন বয়েস হয়েছে—সকলকেই এখন ভয় হয়।

সুলতান একটু হেসে বললেন—তোমাকে আমি যেতে বলিনি পুরন্দর, যারা যুবক ও সাহসী তারা যাবে।

অনেকেই সাজল। সুলতান প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন প্রাঙ্গন অশ্বে পূর্ণ। তার মধ্যে একটি খুব তেজস্বী ঘোড়া সুলতানের চোখে পড়ল, তার পিঠ যেন ধনুকের মত, গ্রীবা কতকটা রাজহাঁসের গ্রীবার মত, কটিতট ক্ষীণ, ক্ষুরের ওপর দিকটাও ক্ষীণ; অনেক ঘোড়ার মধ্যে সেই ঘোড়াটাকে সুলতানের মনে ধরল। দেখলেন, সেই অশ্বের বল্গা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং অশ্বশালাধ্যক্ষ। সুলতান খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এ অশ্ব কোথায় পেলে ?

—জাঁহাপনার অশ্বশালেই ছিল।

—সে কি! এমন ঘোড়া থাকতে আমাকে এতদিন একটা গাধা দেওয়া হত!

পুরোনো অশ্বশালা-রক্ষক দেখল মহাবিপদ, কি বলতে সে অগ্রসর হলো। অমর তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে বারে বারে কুর্নিষ করতে করতে নিবেদন করলেন, এর পিঠে চাপলেই জাহাপনা বুঝতে পারবেন, এমন তেজী ঘোড়া সম্রাট লোদিরও নেই।

সুলতান খুশী হয়ে ঘোড়ার উপর উঠে বসলেন। অমর অশ্ব-বল্গা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করলেন, এবং সুলতানের আগে গিয়ে বিলম্বিত বৃক্ষশাখা তরবারি দিয়ে কাটতে কাটতে এগিয়ে চললেন। গোপীনাথ ও আর সকলে প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অমরকে দেখতে লাগলেন। বিতাড়িত অশ্বশালা-রক্ষক হাত জোর করে উজীরকে বললেন—হুজুর এ ঘোড়া এখানে ছিল না হালে দিল্লী থেকে আনিয়েছে। একটা মিথ্যা কথা বলে স্বচ্ছন্দে আমাকে অপদস্থ করল, কথাটা আমাকে ভেঙ্গেও বলতে দিল না।

গোপীনাথ বললেন—দেখ কেশব, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে উজীর হবে। তোমরা এর বিরুদ্ধাচারণ করো না, যার প্রতিভা আছে, তাকে উঠতে দাও; না দাও তুমিই মরবে। অমরকে দেখলে সত্যই আমার আনন্দ হয়।

—আপনি থাকতেই যুবক উজীর হবে ?

—না, তা হবে না, কিন্তু আমি আর ক'দিন ? বৃদ্ধ হয়েছি বড় জোর আর দু-চার বছর আছি।

পরদিন সকালে হোসেন শাহ যখন সভাতে বসে আছেন, তখন গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কাল নাকি জাঁহাপনার বিপদ গেছে ?

—শিকারে কথা বলছ ? সে আর বিপদ কি ? তাদের মারতে গেছি তারা ত আর আমাদের আদর করবে না।

একটা আহম্মক ভুইয়া বলে উঠলেন,—সর্দার অমরনাথ পাশে না থাকলে শের জাহাপনাকে আস্ত রাখত না।

অমরনাথ সতেজে বলে উঠলেন, যা আপনি স্বচক্ষে দেখেননি জাফর আলি, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না। আপনারা দূরে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আমি ও সুলতান ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না।

—আমি পালাইনি—কাছেই ছিলাম নিজের চোখে দেখেই বলছি।

—আপনি ভুল দেখেছেন।

একটু হেসে গোপীনাথ অমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কি হয়েছিল অমর ?

অমরনাথের মুখটা লাল হয়ে উঠল ; সে মাথা নামিয়ে বলল—ব্যাপার অতি সামান্য ; সুলতান বাঘটাকে সড়কি দিয়ে আঘাত করে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললেন ; আঘাতটা এত জোরে হয়েছিল যে, সড়কি ভেঙ্গে গেল, বাঘ আবার ঠেলে উঠল। আমি ভয়ে সুলতানের পেছনে লুকিয়ে চীৎকার করে উঠলাম, সুলতান রক্ষা করুন। সুলতান তখন খড়্গের আঘাতে বাঘের মাথা কেটে ফেললেন। আমি আর করেছি কি ? খাঁ সাহেবের মত প্রাণভরে না পালিয়ে সুলতানের পেছনে ছিলাম এই যা।

সভা নিস্তব্ধ ; অনেকেই বুঝলেন অমরনাথ আগাগোড়া মিথ্যা বলছেন।

সুলতান বললেন—আমার তরবারিও আঘাতের প্রচণ্ডতায় ভেঙ্গে গেছে। আচ্ছা পুরন্দর, এ দেশে ভাল ইস্পাত জন্মায় না কেন ?

পুরন্দর কোন উত্তর না দিয়ে অমরনাথের দিকে চেয়ে রইলেন। অমর কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু গোপীনাথের সকৌতুক দৃষ্টি তাঁর চোখে পড়বামাত্র তিনি কিছু বললেন না। কেশব ছত্রী বললেন—জন্মায় জাহাপনা !

সুলতান অমরকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি ধারণা অমরনাথ ?

অমর বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন—আপনার প্রচণ্ড পরাক্রম ধারণ করতে পারে এমন ইস্পাত পৃথিবীর কোথাও জন্মায়নি।

সকলেই কৌশলী অমরনাথের কথায় তারিফ করে বললেন—এতোঠিক বাৎ !

সুলতান তখন ডাকলেন—সর্দার অমরনাথ।

—জাঁহাপনা !

—তুমি কি চাও ?

—জাঁহাপনার যদি গরীবের প্রতি কৃপা থাকে তবে একটি প্রার্থনা জানাই। জাহাপনার এই দরবার অতি পবিত্র। এখানে যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে, তবে তার দণ্ড হওয়া উচিত।

—তুমি ঠিক বলেছ।

—তাই আমি প্রার্থনা করি গফুর আলি অতঃপর দরবার থেকে বিতাড়িত হন।

ওমরাহেরা বুঝতে পারল এই যুবক খুবই প্রতিভাসম্পন্ন। তারা তাই চুপচাপ ঘটনার গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

সুলতান বললেন—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করলাম। গফুর আলি দরবারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

আরক্ত চোখে গফুর আলি দরবার ত্যাগ করলেন।

সুলতান বললেন—সর্দার অমরনাথ, তোমার মত কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি দরবারও রাজ্যের সম্পদ। আমি তোমাকে নগর কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত করলাম।

অমরনাথ অভিবাদন করলেন।

গোপীনাথ বলে উঠলেন—জাহাপনা বোধ হয় জানেন না, অমর নাথের একটি ছোট ভাই আছেন। আমার প্রার্থনা তাঁকে অশ্বশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হোক।

—আমি সানন্দে প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম।

গোপীনাথ বললেন—জাহাপনা, এই দুই ভাই একদিন আপনার রাজ্যের স্তম্ভ হবে। এই বুড়ার কথা মনে রাখবেন—এর থেকে আপনার রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হবে। এমন অসাধারণ প্রতিভা···

সুলতান মৃদু ঘাড় নেড়ে গোপীনাথের কথা অনুমোদন করলেন।

অমরনাথ আর একবার সুলতানকে অভিবাদন জানালেন।

পাঁচ

তারপর কেটে গেছে সুদীর্ঘ ছুটি বছর।

সুলতান হোসেন শাহ একদিন দরবারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনারা কি কেউ বলতে পারেন ক্ষুদ্র ত্রিপুরাজের কাছে আমরা পরাস্ত হলাম কেন?

একজন বললেন—বোধ হয় সেনাপতি ছোটে খাঁর জন্যে।

আর একজন বললেন—আমাদের পক্ষের একজন সৈনাধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্যে।

কেউ বললেন—আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম ছিল, তাই…

সুলতানের কোনও কথাই ঠিক মনের মতো হলো না। তিনি অমরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—তোমার কি মত কোতোয়াল সাহেব?

অমর ধীরভাবে উত্তর দিলেন—আমাদের নৌকো ছিল না বলে, জাহাপনা।

—সে কি রকম?

—ওসব পার্বত্য দেশে অনেক নদী। বর্ষায় দেশ গেল ভেসে। আমাদের দাঁড়াবার স্থান রইলো না। সেই সুযোগে শত্রু সেনাপতি আমাদের বিব্রত করে তুললেন। রসদ বন্ধ হলো। কত ঘোড়া মারা গেল। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের পালিয়ে আসতে হলো।

প্রৌঢ় সেনাপতি ইসমাইল গাজী তাঁর দাড়ি নেড়ে বললেন—কোতোয়াল সাহেব ঠিক কথা বলেছেন।

সুলতান বললেন—তোমার বুদ্ধি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি অমর। আমি তোমাকে যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী করলাম। তোমার নাম হলে সাকর মল্লিক (জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ)।

অমরনাথ সুলতানকে ধীর অভিবাদন জানালেন।

আরও কিছুদিন পরে।

গোপীনাথ ততদিনে কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। একদিন সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা আমরা কিছুতেই উড়িষ্যা জয় করতে পারছি না কেন?

সেনাপতি ইসমাইল গাজি তাঁর দাড়ি নেড়ে গভীর চিন্তা করে বললেন—প্রতাপরুদ্র বড় শক্ত রাজা আছে জাহাপনা।

সুলতান হেসে বললেন—তা ত আছে। কিন্তু আমরাই বা এমন কি নরম?

—আমাদের ওখান থেকে সেজেগুজে রসদ নিয়ে যেতে হয়, আর ওরা—

—সে সব কথা ত আমিও জানি। আমি জানতে চাই, কোনও উপায়ে আমরা উড়িষ্যা জয় করতে পারি কিনা?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

সুলতান বললেন—তুমিও কি কোনও উপায়ের কথা বলতে পার না সাকর মল্লিক?

সাকর মল্লিক বললেন—জাহাপনা আমাদের কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে।

—কি কৌশল?

—যখন প্রতাপরুদ্র রাজ্যে থাকবে না, তখন আমরা আক্রমণ করব।

সেনাপতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—আমরা কি তাঁকে জোর করে রাজ্য থেকে সরিয়ে দেব নাকি?

সাকর মল্লিক বাধা দিয়ে একটু রাগত ভাবে বললেন—ব্যস্ত

হবেন না সেনাপতি সাহেব, সুলতানের কাছেই আমি যা বলবার তা বলব।

সুলতান সেনাপতির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইলেন।

সাকর মল্লিক বললেন—আমরা দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাব। প্রতাপরুদ্র প্রচুর সৈন্য নিয়ে সে দিকে ছুটে যাবে। সেই সুযোগে আমরা উড়িষ্যা আক্রমণ করব।

—কিন্তু যুদ্ধ বাধাব কেমন করে?

—তার ভার আমি নিলাম জাহাপনা।

—কিন্তু পথটা বলুন না।

—দক্ষিণে বিজয় নগরের সঙ্গে প্রতাপের বহুদিনের বিবাদ জানেন ?

—কথাটা সত্য।

—আমরা যদি তাদের অস্ত্র সাহায্য দেই, ওরা দক্ষিণে গোলমাল সুরু করবে।

—বাঃ, চমৎকার পরামর্শ। তোমার মত জ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞ এ সভায় কেউ নেই সাকর মল্লিক। সত্যিই গোপীনাথের ভবিষ্যৎ বাণী আজ সার্থক হয়েছে। তোমার থেকে এ রাজ্যের অনেক শ্রী বৃদ্ধি হয়েছে। আমি তোমাকে উজীরের পদ দিলাম সাকর মল্লিক। তুমিই দক্ষিণে যাবে যুদ্ধ বাধাতে। যুদ্ধ-আয়োজনের সব ভারও তোমার ওপর থাকল।

সাকর মল্লিক অভিবাদন করলেন।

সুলতান বললেন—ফেরার পথে গড় মান্দারনে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তখন আমরা একত্রে উড়িষ্যা আক্রমণ করব।

সভা ভঙ্গ হলো।

উজীর সাকর মল্লিক তাঁর প্রাসাদে ফিরলেন।

তাঁর চোখ মুখে কেমন যেন চিন্তার ছায়া। ঘোড়ায় চড়ে একা তিনি চললেন প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদ একটু দূরে। রামকেলির উত্তরে সনাতনের খনন করা সনাতন সরোবর আর রূপ সাগর আজও দেখা যায়। সনাতন সরোবরের পশ্চিমে সাকর মল্লিকের প্রাসাদ। রূপ সাগরের পূর্ব্ব-হলো দবীর খাস সন্তোষের প্রাসাদ।

উজীর ঘরে ফিরলেন।

দেখলেন নবদ্বীপবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্যে তাঁর দ্বারে দণ্ডায়মান।

সাকর মল্লিক তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

একে একে তাঁরা তাঁদের অভাবের কথা উজীরের কাছে নিবেদন করলেন। কারও ঘর পুড়ে গেছে, কেউ টোল করবেন, কেউ বা কন্যাদায়গ্রস্ত।

সাকর মল্লিক ধীরে ধীরে বললেন—আমি মুসলমানের ভৃত্য। যবন প্রভুর ইংগিতে আমি হিন্দুর সর্বনাশ করি—আপনারা কোন ভরসায় এসেছেন আমার সাহায্য নিতে ?

একজন ব্রাহ্মণ বললেন—আমরা এসেছি হিন্দুর কাছে। হিন্দুকে হিন্দু না দেখলে কে দেখবে ?

মৃদু হেসে উজীর বললেন—আপনাদের কথা শুনে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার ভাণ্ডার খুলে দিচ্ছি। আপনাদের ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণেরা উচ্ছসিত কণ্ঠে উজীরকে আশীর্বাদ করলেন।

তাঁদের প্রত্যেককে ইচ্ছামত অর্থ দিয়ে উজীর প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা আপনারা কি কেউ নিমাই পণ্ডিতের খবর বলতে পারেন ?

একজন ব্রাহ্মণ বললেন—নিমাই পণ্ডিত কিছুদিন আগে দীক্ষা নিয়ে গয়াধাম থেকে ফিরে এসেছেন। বিখ্যাত ঈশ্বর প্রেমী সাধু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তাঁকে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দিবারাত্র তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। অবিরাম

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন। অনেকে বলছেন, তিনিই নাকি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

উজীর সাকর মল্লিক সুদূর আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে ধরলেন। কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর চোখ দুটি ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তাঁর সমস্ত বক্ষ আলোড়িত করে বেরিয়ে এক ঝলক উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

॥ ছয় ॥

হরিদাস যে পথ দিয়ে চলেন, সেখানেই দলে দলে লোক তাঁর ব্যাকুল কৃষ্ণপ্রেম দেখে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে তিনি সপ্তগ্রাম ছেড়ে এলেন শান্তিপুরে। সেখানে অদ্বৈতাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে গঙ্গাতীরে বাস করতে লাগলেন।

নিমাই পণ্ডিতের নাম তখন সারা দেশে বিস্তৃত। অনাবিল হরিনাম আর কৃষ্ণপ্রেমে তিনি চারিদিক মাতিয়ে তুলেছেন। হরিনামের একটা প্রবল স্রোত নবদ্বীপ আর শান্তিপুর প্লাবিত করে তুলেছে।

হরিদাস মনের আনন্দে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। দিনরাত তার হরিনাম জপ করে কাটতে লাগল। কিন্তু এ আনন্দ তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

শান্তিপুর আর নবদ্বীপের শাসনকর্তা তখন ছিলেন গোরাই কাজী। তিনি দেখলেন হরিনামে সারা দেশে একটা নতুন বিপ্লবের সূচনা করছে।

ইসলাম ধর্মীরা এতে বড়ো অসন্তুষ্ট হতে লাগলো। যারা সম্প্রতি মুসলমান হয়েছে এমন অনেক লোক সেদিকে ঝুঁকতে লাগলো।

কাজী স্থির করলেন, এ ক্ষেত্রে কাউকে বিশেষভাবে শাস্তি না দিলে এ জোয়ার রোধ করা যাবে না। আর এই নতুন ধর্ম আন্দোলনকে বন্ধ করতে না পারলে অচিরে ভারতভূমি থেকে ইসলাম ধর্মকে চিরবিদায় নিতে হবে। কিন্তু কোন লোককে শাস্তি দিয়ে ভয় দেখানো যেতে পারে?

নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে—নিমাই পণ্ডিত বা অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে ঘেঁসবার যো নেই। তাদের কোনও স্বজনের শরীরে হস্তার্পণ করলে সমস্ত দেশ ক্ষেপে উঠে দেশে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত করতে পারে। তাতে তিনি নানাপ্রকারে বিপদগ্রস্ত হতে পারেন, সুলতানের নিকটেও তিরস্কৃত হবার সম্ভাবনা। তবে কাকে ধরা যায়?

এক আছে নিরাশ্রয় হরিদাস। কাজি সাহেব তাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে ধরে নিলেন।

হরিদাস অনাথ কাঙ্গাল; হরিদাসের বন্ধু নেই আত্মীয় নেই, অর্থ নেই হরিদাসকেই উপযুক্ত পাত্রবোধ করলেন। কাজি প্রকাশ করলেন, হরিদাস কেন মুসলমান হয়ে হরিনাম করে?

হরিদাসের গুরুতর অপরাধের বিচার তিনি নিজেই করতে পারতেন কিন্তু সুলতানের কাছে কিঞ্চিৎ যশের আশায় হরিদাসকে গৌড়ে বিচারের জন্য পাঠালেন।

ধর্ম্মপরায়ণ ও মহাপণ্ডিত গৌড়ের কাজি তোগলক্ খাঁ হরিদাসের বিচার করতে বসেছেন।

সুলতান সিংহাসনে বসেছেন; উজীরও অমাত্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে বসেছেন।

তোগলক্ খাঁ সুলতানকে অভিবাদন করে বললেন—আপনার ভৃত্য কাজি গোরাই খাঁ এই গৌড় রাজ্যের পরম হিতৈষীও ইসলাম ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। আপনার ভৃত্যদের মধ্যে তাঁর ন্যায় কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ অতি অল্পই আছেন। তিনি আশঙ্কা করছেন কতকগুলো কাফের এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ও এই অজেয় গৌড়রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টা করছেন। শান্তিপুরও নবদ্বীপ প্রদেশে একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে এখনও বেশী দূর বিস্তৃত হয় নাই। বিস্তৃত হবার আগেই তিনি বিদ্রোহীদের নেতা হরিদাসকে কৌশলে ধরে বিচারের জন্য জনাবের দরবারে পাঠিয়েছেন।

সুলতান বললেন—বিদ্রোহ? আমার রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ? উজীর সাহেব, সে কথা ত তুমি আমাকে বলনি?

উজীর বললেন—বিদ্রোহ কোথাও থাকলে আপনাকে বলতাম জাহাপনা। কাজি সাহেব আগাগোড়া আপনাকে ভুল বুঝিয়েছেন বিদ্রোহ কোথাও নেই। এক ব্যক্তিহ রিনাম করে বেড়ায় তাকেই ধরে গোড়াই কাজি পাঠিয়েছে। সে জাহাপনার কাছে কিছু ইনাম চায় আর আমাদের কাজ তোগ্‌লক্ খাঁ কিছু যশঃ প্রার্থী। কারও কোন কাজ নেই কি করেন।

সুলতান একটু হেসে বললেন—তাই নাকি কাজি সাহেব?

কাজি বললেন—কি আর বলব জনাব। উজীরের কথার উপর কথা বলতে আমার সাহস হয় না। এখনই দেখতে পাবেন, আমার কথা সত্য কিনা—আমি অপরাধীকে আস্‌তে আদেশ দিয়েছি।

বাঁধা অবস্থায় হরিদাসকে আনা হলো। দরবারের একাংশে একটি মঞ্চ ছিল হরিদাস তার উপর দাঁড়িয়েছিল। প্রহরী জল্লাদ তাঁর আশে পাশে দাঁড়াল। হরিদাসের বদনমণ্ডলে চিন্তার ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না; বরং তাঁকেই যেন প্রফুল্ল বলে মনে হলো। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে হরিদাস রাত্রে নামকীর্ত্তনে অতিবাহিত করেছেন। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লতা এসেছে। হরিদাসের দোহারা চেহারা ছিল গায়ের রংও ছিল শ্যামবর্ণ। কিন্তু তাঁর মুখে এমন একটা কমনীয় ভাব ছিল সমস্ত দেহকে বেষ্টন করে এমন একটা জ্যোতিঃ ছিল যে তাঁকে দেখলেই মনে হতো ইনি সাধারণ হতে স্বতন্ত্র।

কাজি বন্দীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

—হরিদাস।

—তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

—আমি হরিনামশ্রয়ী।

—সে কি? তুমি হিন্দু না মুসলমান?

—জাত আমি ঠিক জানি না—আমি জানি শুধু হরিনাম।

—দেখছি তুমি লোক বড় সোজা নও, তোমার ঘর কোথা ?

—শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ছিল ; এখন আর নাই কাজি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

—বেশ করেছেন। তোমার বাপ কাফের না মুসলমান ছিলেন ?

—তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পীর আলি জোর করে তাঁকে মুসলমান করেছিল।

—উত্তম করেছিলেন এতে তাঁর দয়ারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে বুঝা গেল, তুমিও তোমার বাপের সঙ্গে মুসলমান হয়েছিলে।

—আমি তখন শিশু মাত্র।

—তর্ক করো না—প্রমাণ হলো, তুমি মুসলমান হয়েছিলে।

—এত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কি ? আমাকে যে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হয় তাই, দিন.।

এবার সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এমন পবিত্র ধর্ম্মগ্রহণের পর কেন আবার হরিণাম কর ?

—আমি যে হরিনাম না করে থাকতে পারি না সুলতান।

—আল্লার মাম ছেড়ে হরিনাম ধরলে কেন ?

—আমি ত ধরিনি, কে আমায় ধরিয়েছে।

—তুমি হরিনাম ত্যাগ করো।

—খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় যদি.প্রাণ

তবুও বদনে আমি না ছাড়ি হরিনাম।

—আমি তোমাকে পদ দেব, জায়গীরদের, ঐশ্বর্ধ দেব—

আমি যে ঐশ্বর্ধের কাঙ্গাল, তা যে তোমার ভাণ্ডারে নেই সুলতান।

কাজি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন একে কুত্তা দিয়ে ?

সুলতান গম্ভীরভাবে বললেন না।

—একে জ্যান্ত কবর?

—না।

—তবে কি মুক্তি দিতে চান?

—আমার ইচ্ছা তাই কিন্তু—

—তা হলে জাহাপনা দেশে আর ধর্ম্ম থাকবে না। আমাদের ধরে ধরে হিন্দু করবে।

—তোমার অভিপ্রায় কি?

—সহর ঘুরিয়ে কোড়া লাগাই।

সুলতান একটু ইতস্ততঃ করে সম্মতি দিলেন। হরিদাস একটুও বিচলিত হলেন না—হাসিমুখে। বিদায়কালে সুলতানের দিকে ফিরে বললেন—সুলতান, ভগবান তোমাকে আরও বড় করুন।

আমি আনন্দে তোমার দণ্ড মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু আমি শুধু বুঝতে পারলাম না, আমার অপরাধ কি? তোমার রাজ্যে কি কেউ হরিনাম করবে না? সামান্য একটি কুঁড়ে ঘরে আমি বাস করছিলাম—রাজ্যের এই প্রান্তে; তাও তোমার সহ্য হলো না? না, অপরাধ আমার আছে। যাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না, তাঁর ইচ্ছাতেই এ দণ্ড। তুমি নিরপরাধ সুলতান! ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন। কই, তোমার জল্লাদ কই?

গৌড় নগরের বাজার ঘুরিয়ে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করা হলো। বেত্রাঘাত সাধারণ নয়—ভীষণ কোড়ার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংস উঠে আসে।

যতো কোড়ার আঘাত পড়ে, ততই হরিদাস বিগলিত অন্তরে আঘাতকারীর জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। বলেন—হা কৃষ্ণ, এরা অজ্ঞ। এরা জানে না কি করছে...এদের তুমি ক্ষমা করো।

হরিদাস মূর্ছিতপ্রায়—তখনও যুক্তকরে বললেন—

'এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে এ সবার নহে অপরাধ।

অঙ্গ তাঁর ক্ষতবিক্ষত—দেহ রক্তাপ্লুত। সে দিকে লক্ষ্য নেই। অবশেষে চেতনা হারিয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন। পড়বার আগে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন—এদের ক্ষমা কর হরি।

জল্লাদ কাজির কাছে সংবাদ দিল হরিদাস প্রাণ হারিয়েছেন। কাজি ভাবলেন, কেমন কৌশলে কাজ উদ্ধার করেছি! সুলতান কিছুতে মারতে দেবে না। এসব আগুনের ফুলকি রাখতে নেই!

সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে আসছে। গোধূলির ম্লান আভায় আকাশ রক্তিম। দিগাঙ্গনা যেন হরিদাসের দেহের রক্ত-আভা দেহে মেখে দীর্ঘনিশ্বাসে পৃথিবীকে ব্যথাতুর করে তুলছে।

হরিদাসের মৃতবৎ দেহ গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হলো। কতো হিন্দু তীরে দাঁড়িয়ে হাহাকার করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করে হরিদাসের বিসর্জন দেখছিলেন। সেই সব দর্শকের সঙ্গে ছদ্মবেশে ছিলেন অমর, সন্তোষ আর অনুপ।

অমর চুপি চুপি বললেন—সন্তোষ, একটা নৌকা নিয়ে হরিদাসের অনুসরণ কর। তিনি প্রাণত্যাগ করেননি—বেঁচে আছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁকে আর এখানে এনো না। ওঁর ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসবে।

সন্তোষ দ্রুতপদে চলে গেলে অমর অনুপের দিকে চেয়ে বললেন—আজকের ঘটনা থেকে কি বুঝলে অনুপ?

—মুসলমানের অত্যাচারী।

—না, মুসলমানেরা ঠিকই করেছে। আমরাই মুর্খ তাই স্বার্থের নেশায় ওদের সাহায্য করি। আজকের ব্যাপার থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে হিন্দুর ধর্মকে যদি হিন্দু রক্ষা না করে, তবে তা রক্ষা হতে পারে না।

—সেটা ঠিক কথা দাদা।

—সুলতান বিচার করেছে তাঁর স্বধর্মীর মুখ তাকিয়ে, আমিও বিচার করব আমার স্বধর্মীর মুখ চেয়ে। আমি কাজীর প্রতি নির্বাসন দণ্ড দিলাম। তুমি সাত দিনের মধ্যে তাকে সরিয়ে ত্রিপুরেশ্বর রাজ্যে দিয়ে আসবে।

—আচ্ছা দাদা।

—আর গোরাই কাজী হিন্দুদের ওপর বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে। তার কাছে হুকুম পাঠাও, সে যেন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার না করে। হুকুম অমান্য করলে তাকেও গৌড় ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তখন অমর সন্তোষ ফিরে এলেন। অমর প্রশ্ন করলেন—এত শীগ্‌গীর ফিরলে যে?

—আমি গিয়ে দেখলাম তিনি তীরে উঠেছেন। অর্থ, সাহায্য, আশ্রয় সব কিছু তিনি হাসতে হাসতে প্রত্যাখান করলেন। বললেন—আমার ব্যবস্থা সব কিছু শ্রীহরিই স্থির করে রেখেছেন।

—তাঁকে কেমন দেখলে?

—দেহে আঘাতের চিহ্ন কিছুই দেখলাম না।

—জানি না, এ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আর জীবনে কখনও পাব কিনা।

—একটা কথা তিনি বললেন।

—কি কথা?

—বললেন, দুঃখ করো না, শিগ্‌গীরই তোমাদের কর্মক্ষয় হবে। অমর নির্বাক বিস্ময়ে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ সাত ॥

—আমার এ সব আমোদ-প্রমোদ কিছু ভাল লাগছে না সন্নু, সব বন্ধ করে দাও।

—সে কি দাদা, আজ যে তুমি উড়িষ্যা জয় করে ফিরছ।

—আমার সর্ব্বনাশ করে ফিরেছি।

সন্তোষ বিস্ময়ের ভাণ করে বলল—সে কি দাদা, রাজ্যময় তোমার যশ, সুলতান তোমার গোলাম আর তুমি কিনা বলছ তোমার সর্বনাশ হয়েছে।

অমর বলল—উড়িষ্যায় আমি সব হারিয়ে এসেছি।

সন্তোষ বলল—কি হারিয়েছ দাদা?

—হিন্দুত্ব, মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম—

—তা কি আজ হারালে?

—যা কিছু ছিল তা উড়িষ্যায় হারিয়ে এসেছি।

—তাহলে একদিন কিছু ছিল। আচ্ছা দাদা যখন উড়িষ্যা বিজয়ে যাও, তখন কি জানতে না সব হারাতে হবে?

—না সন্নু এতটা হবে তা আমি আগে ভাবিনি। আমি মন্দির ভেঙেছি দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ করেছি, হিন্দুর জাত মেরেছি।

—বেশ করেছ—আরও কর।

—কি বলছ সন্নু?

—ঘোর দুর্ব্বৃত্ত না হলে ত তাঁর দয়া পাওয়া যাবে না। যখন পাপকার্য্যে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হবে তখন তাঁর করুণা তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে।

—এ সব অশাস্ত্রীর কথা বলো না সন্তোষ।

—দাদা তোমারই কাছে শাস্ত্র শিখেছি। তোমারই কথায় বুঝেছি পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বিষদানে মারতে এসে কৃষ্ণের কৃপায় স্বর্গে গেল ; কেন না, সে স্তন্যদান করে মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ছিল। আবার হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু হরিকে সর্বব্যাপী বিশ্বাস করে হরিকে মারতে স্তম্ভ বিদীর্ণ করল ; পরে হরির অঙ্কে শুয়ে হরিকে দেখতে দেখতে প্রাণত্যাগ করল। আর কি চাই দাদা? জীবনের যা কিছু কাম্য সে তা পেল ; অবশেষে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হলো। তাই বলি দাদা হরির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নাও—তা শত্রু বা মিত্ররূপে যে ভাবেই হোক ?

—আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি সন্থু ? আর যে পাপের বোঝা সইতে পারি না।

—যখন গ্রীষ্ম অসহ্য হবে তখনই বর্ষা নামবে। ভয় কি ?

—ভয় অনেক সন্থু।

—পাপে অজামিল হতে পারলে না তাই বুঝি আশঙ্কা করছ ? তবু বলছি ভয় নেই, বোঝা চাপিয়ে যাও।

—তারপর ?

—আমি তাঁরই কৃপার আশায় বসে আছি। নদীয়ায় প্রভুকে বারবার ব্যথা জানিয়ে পত্র লিখলাম ঃ কই কোন উত্তর ত পেলাম না।

—সময়ে পাবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছে প্রাণের সঙ্গে কোন ব্যথা জানালে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন না।

—ঠিক বলেছ সন্থু ; আমি উড়িষ্যা লুঠ করে এসে দেবতা-ব্রাহ্মণের অভিশাপে বুদ্ধি-ধৈর্য সব হারিয়েছি।

—আমার আরও বিশ্বাস তাঁর উপর সকল ভার ছেড়ে দিলে তিনি আমাদের ভার নেবেন। আমরা ভেবে মরি কেন দাদা ?

—সন্থু সন্থু বুকে আয় ভাই, তুই আমায় বড় শান্তি দিলি।

—তোমারই কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিলাম দাদা।

এমন সময় অনুপ ব্যস্ত সহকারে ঘরে প্রবেশ করলেন। বললেন—উড়িষ্যার সংবাদ এসেছে।

—কি সংবাদ ?

—প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ হতে ফিরে উত্তরে পাঠানদের তাড়া করে নিয়ে চলেছেন ; কটক জাজপুর হতে তারা বিতাড়িত।

—ঠিক হয়েছে ; জানি, বাঘ ঘরে ফিরলে ফেরুদল পালাবে। সুলতান তাহলে শীগগীরই ফিরছেন।

—এতদিনে বোধহয় ইসমাইল গাজি গড় মান্দারণে আশ্রয় নিয়েছেন ; আর সুলতান অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়ে গৌড়ের দিকে প্রাণ-ভয়ে ছুটে চলেছেন।

সন্তোষ বলল—সংবাদশুভ।

অমর বলল—ঠিক শুভ নয়, আমাদের মনিব হারলে সেটা আমাদেরও হার।

সন্তোষ বলল—দাদা আমাদের কয় জন মনিব ?

অমর বলল—তাঁকে ত আজও তুমি মনিব করে নিতে পারনি সনু। যে দিন পারবে সে দিন এ মনিবের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করবে।

অনুপ বলল—আমি অত বুঝি না। আমার প্রাণ আজ আনন্দে মেতে উঠেছে—চারিদিকে আমার দাদার জয়ধ্বনি। সকলে বলছে যশ আপনার, কলঙ্ক সুলতানের। ইচ্ছা করছে আজ টেকশাল খুলে বিলিয়ে দি।

অমর বলল—ভুল বুঝেছ সনু যেটাকে যশ বলছ সেটা আমার কলঙ্ক। সে সব কথা যাক : আমাদের এখানকার খেলা শীগগির ভাঙবে বলে মনে হয়। একটু আগে হতে প্রস্তুত থাকায় ক্ষতি নেই।

অনুপ চলে গেল। অমর বলল—দেখ সনু আমি বাইশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করেছি। বিশ লক্ষ পিতার নিকটে পাঠাও আর

বলে দিও দেবকার্যে এবং হিন্দুর উপকারার্থে যেন এই অর্থ ব্যয় হয়। দুই লক্ষ নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানের নিঃস্ব ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠিয়ে দাও। সত্বর ব্যবস্থা করবে—এখন তুমি যেতে পার।

সন্তোষ চলে গেল। তখন গৌড়রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা সাকর মল্লিক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সে করুণ কান্না শুনে পাষাণের বুক থেকেও বুঝি অশ্রু ঝরে পড়ে। এমনি করুণ। বেদনাদায়ক। মর্মস্পর্শী।

॥ আট ॥

পবিত্র কুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বেঁধে হরিদাস মহাশান্তিতে বাস করছেন। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে গঙ্গাপারে নবদ্বীপের দিকে চেয়ে প্রণাম করেন, আর যে দিন অন্য কারও মুখ দর্শন হবার আগে দূর হতে গৌরহরির মুখচন্দ্র দেখতে পান সেদিন আনন্দে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে থাকেন। তিনি গৌরহরিকে দর্শন করতে স্ব ইচ্ছায় বড় একটা নবদ্বীপে যেতেন না। ভয় হোত পাছে তাঁর স্পর্শে ভক্তেরা কলুষিত হন। হরিদাস দূর হতে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করে কৃতার্থ ও ধন্য হতেন।

কিন্তু প্রভু ও নিত্যানন্দ হরিদাসকে ছাড়তেন না। তাঁদের ইচ্ছায় হরিদাসকে নিত্য নবদ্বীপে যেতে হোত এবং সময় সময় সেখানে বাস করতে হোত। তখন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় রোজ রাত্রে কীর্তন হোত এবং মাঝে মাঝে নগর-সঙ্কীর্তন হোত। প্রভুর ইচ্ছায় হরিদাসকে কীর্তনে যোগদান করতে হতো। প্রভু বলতেন—হরিদাস তুমি বড় দুঃখ পেয়েছ এখন প্রাণভরে হরিনাম কর; আর তোমার ভয় নেই—বাধা বিঘ্ন কেটে গেছে।

একদিন দারুণ শীতের দিনে সকালে উঠে হরিদাস নবদ্বীপের দিকে চাইলেন। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে সরে যায়নি। হরিদাস গান ধরলেন—

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া
প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া।

ক্রমে অরুণালোকে নবদ্বীপ বঞ্চিত হলো। হরিদাস দেখলেন নবদ্বীপ যেন আজ হেসে উঠল না—একটা বিষাদভায়ে নবদ্বীপ যেন আজ অবসন্ন হরিদাসের প্রাণ কেঁপে উঠল। তিনি নবদ্বীপে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কিন্তু কিভাবে যাবেন। খেয়াঘাট অনেকটা পথ? তা ছাড়া খেয়া তখনও খোলেনি। হরিদাস অধৈর্য হয়ে পড়লেন—তিনি সাঁতার দিয়ে নদী পার হবার বাসনা করলেন এবং সেই আশায় তিনি গঙ্গায় নামলেন। হঠাৎ সেখানে শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর উপস্থিত হলেন। নরহরি জিজ্ঞাসা করলেন এত প্রত্যুষে স্নানে?

—স্নান নয়।

—তবে কি আত্মহত্যা?

—প্রভুকে যে দেখেছে সে কি আর মরতে পারে!

—তবে যাচ্ছ কোথায়?

—নবদ্বীপে

—নদীগর্ভ তো সরল পথ নয়।

—আমার মন প্রভুর জন্যে খুব উদ্বিগ্ন হয়েছে—নৌকা পথে অনেক বিলম্ব হতে পারে।

—আকাশপথে তো আরও তাড়তাড়ি যাওয়া যেতে পারত

—আমার যে সে ক্ষমতা নেই ঠাকুর।

—সে কি! তোমার মত ভক্তের আবার কিসের অভাব?

—অমন করে বলে আমায় অপরাধী করবেন না ঠাকুর!

—আচ্ছা পরীক্ষা কর, তুমি বল দেখি মা গঙ্গা সরে গিয়ে আমায় একটু পথ দাও। দেখবে সুরধুনী এখনি তোমায় পথ দেবেন।

—ছি ছি, অমন কথা আমি বলতে পারব না; আমার আবার ইচ্ছা কি? প্রভুর ইচ্ছাই ত আমার ইচ্ছা।

—এই জন্যেই ত হরিদাস তোমার তুলনা নেই। যা হোক

তোমাকে আর নবদ্বীপে যেতে হবে না, আমি তোমাকে প্রভুর সংবাদ দিচ্ছি।

—তাঁর সংবাদ কি ?

—শুভ ; মাঝ-রাতে তাঁর চরণ ছেড়ে এসেছি।

—তবে আজ নবদ্বীপ নিরানন্দ কেন ?

—নিরানন্দ আবার কোথায় দেখলে ?

—ওই দেখ, চোখ বুজে দেখ। সারা নবদ্বীপ আজ কেঁদে কেঁদে উঠছে। কান বুজে প্রাণ দিয়ে শোন। কান্নার রোলে নবদ্বীপ কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা হাহাকার ধ্বনি সুরধুনীর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না ঠাকুর। বল, কোথায় গেলে তোমায় পাব—

—ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর হরিদাস ঠাকুর। চিরদিন তুমি ধীর, তবে আজ ধৈর্য হারালে চলবে কেন ?

—নদীয়া আজ শূন্য, আঁধার। ঐ যে সুরধনীর ধারে ধারে তিনি দ্রুতপায়ে একা ছুটে চলেছেন। দাঁড়াও প্রভু, আস্তে চল। চরণে তোমার কাঁটা বিঁধবে যে। আমি বুক পেতে দিচ্ছি, আমার বুকের ওপর দিয়ে যাও। না না, আমার বুক ত পাষাণ তাতেও তোমার চরণে লাগবে, আমার মাথার ওপর দিয়ে যাও…প্রভু, প্রভু…

বলতে বলতে হরিদাস মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

ঠাকুর নরহরি ছুটে এসে হরিদাসকে ওঠালেন। জল থেকে উঠিয়ে শুকনো ডাঙায় শুইয়ে দিলেন।

এমন সময় দূর থেকে কার ডাক শোনা গেল—হরিদাস, হরিদাস… হরিদাস অচৈতন্য অবস্থাতেই উত্তর দিলেন—কে ? রঘুনাথ ?

চীৎকার ক্রমে এলো কাছে।

হরিদাস সেই অবস্থাতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—নবদ্বীপে আর কেন রঘুনাথ ?

রঘুনাথ তা শুনলেন না। তিনি বলে উঠলেন—হরিদাস, নবদ্বীপ আজ আঁধার—চাঁদ নিভে গেছে।

সহসা রঘুনাথ দেখতে পেলেন বালুকা বেলায় হরিদাসের অচৈতন্য দেহ। রঘুনাথ ছুটে গিয়ে হরিদাসের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে বলে উঠলেন—হরিদাস, গুরু আমার, তুমিও কি আমার ছেড়ে চললে? তারপর প্রবল উত্তেজনায় কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে হরিদাসের চেতনা ফিরে এলো। উঠে বসে বললেন —ছি ছি, কি করলে রঘুনাথ? বলেই তাড়াতাড়ি পা টেনে নিলেন।

রঘুনাথ বললেন—হরিদাস, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে...

বাধা দিয়ে হরিদাস বললেন—জানি, প্রভু গঙ্গার ওপর দিয়ে কাটোয়ার দিকে চলেছেন।

—চল, আমরাও যাই। দুখানা নৌকা তৈরী আছে।

—বেশ, চল।

ব্যাকুল উদ্বেলিত অন্তরে তিনজনে একসঙ্গে ছুটে চললেন নৌকার দিকে। তাঁদের সে উচ্ছসিত হৃদয়ের সাক্ষ্য বহন করে কল্লোল আবর্তে পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে চলল পুণ্যতোয়া জাহ্নবী।

॥ নয় ॥

কাটোয়াতে আজ বড় ভীড়।

সুরধুনীর তীরে কেশব ভারতীর আশ্রম। আশ্রম প্রাঙ্গণে এক প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষ। তার মূলে দশদিক আলো করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু উপবিষ্ট। তাঁর চরণ নখর জোতির্ময়। কোমল চরণ তল ধ্বজবজ্র অংকিত। অঙ্গ পদ্মগন্ধ আমোদিত।

মহাপ্রভুর চারপাশে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী। চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতি। প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে একটা অপূর্ব ভক্তিভাব। দলে দলে পথচারী ও দূর থেকে তাঁদের দেখে একে একে এসে জড়ো হয়। তারপর বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর দিকে চেয়ে নিজেরাও পরম বিস্ময়ে, ভক্তিতে, পুলকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রভুর সামনে কেশব ভারতী উপবিষ্ট। মুণ্ডিত মস্তক, সারা দেহে তিলক চন্দনের অনুলেপন, মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। অপূর্ব জ্যোতিতে সে মুখ ভাস্বর।

কেশব ভারতীর দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে প্রভু বলেন—আর দেরী কেন আচার্য? এবারে তাহলে দীক্ষার আয়োজন করুন।

কেশব ভারতী বলেন—তা আমি কিছুতেই পারব না—এ অনুরোধ আমায় তুমি করো না। সন্ন্যাস নেবার সময় তোমার হয়নি।

প্রভু বলেন—কিন্তু আপনি আমায় দীক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত। সে প্রতিশ্রুতি কি আপনি রক্ষা করবেন না?

কেশব ভারতী বলেন—তোমার সঙ্গে আমি ত কথায় পারব না—তুমি ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তবে আমার ইচ্ছা নয়—

প্রভু বলেন—আর কতদিন পরম পবিত্র কৃষ্ণনাম থেকে আমায় বঞ্চিত করে রাখবেন দেব?

প্রভুর সারা দেহে পুলক শিহরণ। অপূর্ব আবেশে তিনি পরিপূর্ণ। চোখের কোণে প্রেমাশ্রু।

প্রভুর নয়নের অশ্রু কেশব ভারতীর হৃদয় দ্রবীভূত করে। তিনি বলেন—বেশ আমি প্রস্তুত। কিন্তু এখন অন্য সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে তোমায়।

কিন্তু এদিকে আর এক বাধা উপস্থিত হলো। দলে দলে নারীরা গঙ্গাস্নান শেষ করে এসে সমবেত হয়েছিল কেশব ভারতীর আশ্রমের চারপাশে। তার সঙ্গে এসেছিল কিছু যুবক। কৈশোরের গণ্ডী অতিক্রম করেনি এমন এক পরম রূপবান পুরুষকে সন্ন্যাস- নিতে দেখে তারা বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়। তার পর যখন শোনে যে তাঁরা মা জীবিত, গৃহে স্ত্রী বর্তমান, তখন তাদের বিরক্তি আরও চরমে ওঠে

যুবকেরা বাধা দিয়ে বলে—তোমার এ অন্যায় দীক্ষাদান বন্ধ কর ভারতী। এই তরুণ বয়সে এই যুবক মস্তক মুণ্ডিত করে হবে দণ্ড কমণ্ডলুধারী সন্নাসী? তা কিছুতেই হতে পারে না!

কেশব ভারতীর শিষ্যেরা অনেক কষ্টে যুবকদের শান্ত করে। তরুণ স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায়—কাজেই তাকে বাধা দান উচিত নয়।

যুবকরা কিছুটা শান্ত হলে সমাগত নারীরা বাধা দিয়ে বলে—এ কোন্ মায়ের কোল ছেঁড়া বাছা—একে তুমি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দিও না ভারতী। এ কি সইতে পারে সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতা? বাছার কেমন ননীর মতো কোমল দেহ…এতটুকু উপবাসেই বাছার মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

কেশব ভারতী এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

শ্রীমন্ প্রভাপ্রভু তখন সমবেত নারীবৃন্দের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলেন—দুদিনের জন্যে এই পৃথিবীতে এসেছি, কবে যে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে তা কেউ জানে না। তবে কি এ জন্মে আমি শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা করবার অবকাশ পাব না মা? শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্যেই মনুষ্য জন্ম। তবে কি একটা জন্ম বৃথা যাবে? আমি মা অতি সামান্য মানুষ, ভাল-মন্দ কিছুই বুঝি নে। আমার প্রাণ কাঁদছে আমার বৃন্দাবনেশ্বরের জন্যে। তিনিই আমার মা, আমার পিতা, আমার স্বামী। তিনি ছাড়া আমার যে আর কিছুই নেই মা। আমার অপরাধ নেবেন না, আমায় আপনারা অনুমতি দিন।

বলতে বলতে প্রভুর দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

সমবেত রমণীরা সে বন্যার সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে সকলে বিরত হলেন।

যাঁরা সন্ন্যাসে বাধা দিয়েছিলেন তাঁরাই বিপুল দ্রব্যসম্ভার এনে সেই পুণ্যময় ক্ষেত্রে ফেলতে লাগলেন। কেউ আনলেন বস্ত্র, কেউ ফুল-চন্দন, কেউ দধি-মিষ্টান্ন।

কয়েকজন বৈষ্ণব খোল করতাল নিয়ে গান ধরলেন:

হরি হরয়ে নম, কৃষ্ণ যাদবায় নম,
যাদবায়, মাধবায়, কেশবায় নম।

পবিত্র হরিনামের রোল সবার অন্তরকে এক পরম পুলকে অভিসিঞ্চিত করে তুলল। দলে দলে লোক যোগ দিল সেই হরিনামে। পবিত্র হরিনাম ধ্বনিতে বাতাস হলো মধুময়।

দু একজন যুবক ছুটলেন নাপিত ডাকতে। সহরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নাপিত মধুসূদন। যুবকেরা তাকেই ডেকে আনল প্রভুর সন্ন্যাসের জন্যে। মধুসূদনের মনে ইচ্ছা ছিল, সেও তার মৃত পিতার মতো কোনও ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন করে তাকে

সন্ন্যাসী করবে। তার পিতা জীবিতকালে প্রায়ই মধুকে এই গল্পটি করতেন। মধু তাই আনন্দের সঙ্গে বেশ দ্রুত পায়ে আসছিল।

কিন্তু কাছে আসতেই তার নজরে পড়ল প্রভূর জ্যোতির্ময় অঙ্গকান্তি।

নিমেষে যেন মধুর মনের সব আনন্দ নিভে গেল। তারপর তার কাছে এসে মধু দেখতে পেল প্রভূর করুণাঘন বদনচন্দ্র। দেখতে দেখতে কি একটা শক্তির প্রভাবে সে যেন এলিয়ে পড়ল। সে মাটিতে বসে এক দৃষ্টে প্রভুকে দেখতে লাগল। দেখে দেখেও যেন আশা মেটে না?

একটু পরে প্রভূকে প্রণাম করে বলল—ঠাকুরের কি আজ্ঞা?

প্রভু মিষ্টকণ্ঠে বললেন—আমায় খালাস কর হরিদাস, আমি বৃন্দাবনে যাই। তাহলে দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় তোমাকে কৃপা করবেন।

প্রভূ মধুকে হরিদাস বলে সম্বোধন করলেন।

মধু বলল—আমায় ক্ষমা করবেন ঠাকুর, আমা হাতে মুণ্ডন হবে না। বলেই যে উঠে দাঁড়ায়।

প্রভু বললেন—যেও না হরিদাস, আমায় উদ্ধার কর।

—আমিই বা তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করেছি ঠাকুর যে জগতে এত নাপিত থাকতে, আমাকেই বধ করতে তোমার বাসনা হলো?

—এভাবে বলে আমায় কষ্ট দিও না হরিদাস। আমাকে খালাস কর, তোমার বংশবৃদ্ধি হবে, তোমার সুখ সৌভাগ্য হবে—

—আমায় দয়া কর প্রভূ। যদি আমার বংশের সকলের ঘোর নরকবাস হয়, আমার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়, আমার সর্বস্ব ধ্বংস হয় তবুও তোমার ও ভ্রমর কৃষ্ণ কেশে আমি হাত দিতে পারব না ঠাকুর।

—আমি তোমায় মিনতি করছি হরিদাস, আমায় এ যাত্রা উদ্ধার কর। তোমার ধর্ম্ম হবে, পুণ্য হবে।

যারা ধর্ম—পুণ্য চায়, তাদের তুমি লোভ দেখাওগে—আমি ওসব চাই না। ওসবে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

—আমি কাঙাল, আমি তোমায় কি দিতে পারি হরিদাস?

—তোমার সোনারূপো কে চায় ঠাকুর, এক ঘড়া মোহর দিলেও আমি এ কাজ করতে পারব না।

—হরিদাস, তুমি অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে, বৈকুণ্ঠে যাবে···

—ও, সেই লোভ দেখিয়েই বুঝি ওই শুকনো ভারতী সন্ন্যাসীকে বশ করেছ? আমার কাছে ও সব চলবে না। আমি তোমার স্বর্গ-টর্গ, ধর্ম-পুণ্য সুখ-সৌভাগ্য কিছুই চাই না—তুমি আর কাউকে ধরে এনে দাওগে।

—তবে কি হরিদাস আমার সন্ন্যাস নেওয়া হবে না?

—তুমি এক কাজ কর। সন্ন্যাস নিতে হয় নাও, কিন্তু মস্তক মুণ্ডন করো না।

—সে কি করে হয় হরিদাস? আগে মুণ্ডন তারপর সন্ন্যাস—

—তবে আর তোমার সন্ন্যাস নেওয়া হলো না। এ কথা জেনে রেখো ঠাকুর যে আমি না করলে এই অঞ্চলের কোনও নাপিত তোমার মাথায় হাত ছোঁয়াবে না।

প্রেমের কাছে প্রভু পরাস্ত হলেন। যে স্বর্গ চায় না, বৈকুণ্ঠ চায় না, ধন-দৌলত টাকা কড়ি কিছুই চায় না, ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষকে যে হেলায় জয় করেছে, তাকে তিনি কি দিয়ে ভোলাবেন? কি দিয়ে তাকে বাঁধবেন? প্রভু তাকে মুগ্ধ করতে পারলেন না, মুগ্ধ হয়ে বাঁধা পড়লেন।

প্রভু তখন প্রেমপূর্ণ নয়নে মধুর দিকে চাইলেন।

সে দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড দ্রবীভূত হয়। পাষাণও গলে যায়। হৃদয়ের সূক্ষ্ম প্রতিটি তন্ত্রীতে তোলে অনির্বচনীয় করুণ ঝংকার।

মধু কেঁপে উঠল। তার দেহ কণ্টকিত হল। একটা অব্যক্ত শক্তি এসে তার হৃদয় কবাট ভেঙে ফেলল। হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে দোলা লাগল। একাগ্র, বিস্ময় পূর্ণ দৃষ্টিতে সে প্রভুকে দেখতে লাগল। তারপর ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করে বলল—আমি বুঝেছি তুমি কে ঠাকুর। তুমি সেই ত্রিলোকের নাথ বৈকুণ্ঠবিহারী। সেবার কৃষ্ণ হয়ে দুর্যোধনকে মারতে এসেছিলে এবারে গৌর হয়ে আমাকে বধ করতে এসেছ। প্রভু, আমায় দয়া কর, এই মাথায় হাত দিতে বলো না।

—আমি মিনতি করছি, আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্র স্নেহ-মমতা থাকে তবে আমাকে উদ্ধার কর হরিদাস।

—তোমার আজ্ঞা উপেক্ষা করি সে ক্ষমতা আমার নেই ঠাকুর। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে গোলোকবিহারী। আমার জাত ব্যবসা পরের পায়ের নখ ফেলা। কিন্তু তোমার মাথায় হাত দিয়ে সেই হাত কি করে আমি লোকের পায়ে ঠেকাব ?

প্রভু বললেন—তোমাকে আর নিজ বৃত্তি করতে হবে না হরিদাস। কৃষ্ণের প্রসাদে তুমি সুখে বাস করবে। তারপর তোমার মৃত্যু হলে বৈকুণ্ঠলোকে হবে তোমার ঠাঁই।

প্রভু তখন নাপিতের সামনে বসলেন। মধুসূদন প্রভুর মাথায় হাত দেবার আগেই তাঁর চরণে হাত দিলেন। স্পর্শমাত্রেই সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার দেহ কাঁপতে লাগল, চক্ষু দুইটি হলো অশ্রুপূর্ণ। সে আর স্থির হয়ে বসতে পারল না, উঠে নৃত্য করতে লাগল।

প্রভু আবার তার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলিয়ে শান্ত করলেন। কিন্তু তিনি নিজেই অশান্ত হয়ে মহানন্দে নৃত্য করে উঠলেন। আনন্দোচ্ছাসে দেহ কণ্টকিত হল। আত্মীয় স্বজনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি হতে চলেছেন ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসী তাই বুঝি তাঁর এত আনন্দ!

কম্পিত হাতে মধুসূদন ক্ষৌরকার্য করলেন। বৈষ্ণব কবি শ্রীমুকুন্দদাস গান ধরলেন—

জাহ্নবী উঠিছে দেখ ফুলিয়া ফুলিয়া,
কতব্যথা হৃদে চেপে উঠে মা কাঁদিয়া।
'চরণ' হতে এসেছ মা, চরণে পড়িয়া,
জননী জানাতে ব্যথা আসে উথলিয়া॥
তরু শাখা দুখভারে পড়ে গো হেলিয়া,
বিহঙ্গম নীড় ত্যজি উড়িল ছুটিয়া।
ত্রিজগৎ স্তব্ধ হলো মরমে মরিয়া
ত্রিভুবন নাথে আজ ভিখারী দেখিয়া॥—পদাবলী

অজস্র নয়নজলে গায়ক শ্রোতা সবাই স্নাত হলেন। সুগভীর, মহান এক ভক্তি-স্পর্শে সকলের হৃদয় পরিপ্লাবিত হলো।

তারপর সেই শুভ লগ্নে সারা জগতের পতি, হ্লাদিনী শক্তিধারী পরমব্রহ্ম মহাপ্রভু সকল জীবকে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে চৈতন্য করাবার জন্যে সামান্য দণ্ড কমণ্ডলু আর জীর্ণ বস্ত্র সম্বল করে নাম গ্রহণ করলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

॥ দশ ॥

তখনও সূর্যদেব পূব আকাশে দেখা দেননি।

ভোর হতে অবশ্য সামান্যই দেরী আছে। পাখির কলকাকলি বাতাসের বুকে ভেসে আসছে।

অমর একা শয্যায় শুয়ে। পাশে শুয়ে পূর্ণযৌবনবতী স্ত্রী অম্বিকা। অমরের ঘুম ভেঙেছে কিন্তু ঘোর কাটেনি।

হঠাৎ অমরের মনে হলো দূর থেকে যেন ভেসে আসছে মিষ্ট কণ্ঠের সংগীত-লহরী।

এ কার গান ? প্রাভাতিক মুহূর্তে কে এই অপরূপ সুর মূর্ছনায় হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ ঢেলে দিয়ে শ্রীভগবানের উপসনায় রত ?

অমর চমকে বিছানায় উঠে বসলেন। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন সে সঙ্গীত। পরম বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ—হতবাক।

গায়ক গাইতে গাইতে বোধ হয় দূরে চলে গেছেন। আর ধ্বনি ভেসে আসছে না। অমর ব্যস্ত হয়ে শয্যাত্যাগ করলেন। সদরে এসে গায়কের সন্ধান নিতে পাঠালেন চারদিকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা এসে বলল যে খুঁজে কাউকেই পাওয়া গেল না।

হঠাৎ অমরের মনে হল এ গায়ক বোধহয় সাধারণ মানুষ নয়। এ গায়ক বুঝি অন্তরীক্ষ থেকে তাকে জাগাতে এসেছিল। হয়ত ইনি প্রভুর প্রেরিত কোন মহাত্মা।

অমর ছুটে গিয়ে তখন সন্তোষকে ঘুম থেকে জাগালেন। পরম হর্ষভরে বললেন—সনু এতদিনে বোধ হয় প্রভু এ হতভাগাদের স্মরণ করেছেন।

—কি হয়েছে দাদা ? কিসে বুঝলে ?

—প্রভু আজ দূত পাঠিয়েছিলেন।

—দূত ? কই ?

তাকে পাওয়া গেল না। তিনি আমাকে জাগাতেই এসেছিলেন—কাজ শেষ করে কোথায় যে চলে গেলেন কোথাও খুঁজে আর তাঁকে পাওয়া গেল না।

অমর সন্তোষকে সব কথা খুলে বললেন। তারপর বললেন—সন্তু আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। প্রভু আমাদের স্মরণ করেছেন।

সন্তুর মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি বললেন—চল দাদা আমরা আজই নীলাচলে যাই। দাসত্ব আর নয়।

অমর বললেন—অপেক্ষা কর সন্তু, প্রভুর কৃপা যখন হয়েছে, তখন আর আমাদের ভাবনা কি ? ঠিক সময়ে তিনিই উদ্ধার করবেন।

—তুমি আমার চেয়ে ঢের ভাল বোঝ দাদা, কিন্তু আমার মন কেমন অশান্ত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা করে নীলাচলে ছুটে যাই।

—জান ত প্রভু এখন নীলাচলে নেই। তিনি দাক্ষিণাত্যে গেছেন কি কোথায় গেছেন তা কেউ জানে না। তাঁকে ত কেউ কখনো খুঁজে পায়না ভাই, ঠিক সময়ে তিনি যে নিজেই এসে ধরা দেন।

—এমন কপাল কি আমাদের হবে দাদা, যে তিনি নিজে এসে খুঁজে নেবেন ?

—হবে ভাই, নিশ্চয় হবে। সে ইংগিতই ভগবান আজ দিয়েছেন।

সন্তোষ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল—কিন্তু উড়িষ্যা থেকে প্রভু আসবেনই বা কেমন করে ? সেখানে বুঝি আবার গোল বাধে।

সে কি। উড়িষ্যায় গোল ?

—প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে উড়িষ্যায় বাস করবার পর তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, একটি মুসলমানও যেন উড়িষ্যায় প্রবেশ না করে।

—সে হুকুম কি কেউ অমান্য করেছে ?

—আজও করেনি, তবে করবার উপক্রম করেছে···

—কার এ স্পর্ধা? তিনি যতো বড়োই হোন আমি তাকে ধ্বংস করব।

—যদি স্বয়ং সুলতান হন?

—তা হলে তাঁরও নিস্তার নেই জেনো। দিল্লীকে আহ্বান করে গৌড় তাদের হাতে তুলে দেব।

—অত উত্তেজিত হয়ো না দাদা, ব্যাপারটা শোন। দুই রাজ্যের প্রান্ত সীমায় গড় মান্দারণ দুর্গ। সেনাপতি ইসমাইল গাজী সেই দুর্গ খুবই সুরক্ষিত করেছে। প্রচুর সৈন্যও সমাবেশ করেছে সেখানে। সুলতানকে যে জানিয়েছে। উড়িষ্যা এখন অরক্ষিত থাকবে, এখন বহু সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে পূর্ব অপমানের শোধ নেবে।

—এত স্পর্ধা ইসমাইল গাজীর? আমায় না জানিয়ে চুপি চুপি বলেছে সুলতানকে? বেশ, আমি উপযুক্ত শাস্তি যদি তাকে না দিতে পারি, যদি তার ছিন্নমুণ্ড ধূলায় না লুণ্ঠিত হয়, তবে জেনে রেখো, প্রভুর চরণে আমার কপট ভক্তি।

—কিন্তু দাদা, ইসমাইল গাজী সুলতানের প্রিয়পাত্র, তাছাড়া বড় বড় সব ওমরাহের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব···

—সব জানি আমি। জেনেই বলছি—

—তবে কি তুমি গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা তাকে হত্যা করাবে?

—ছি ছি, প্রভুর সেবকের পক্ষে এ চিন্তা মহাপাপ।

—তবে?

—তাকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে দাঁড় করাব। সুলতানকে বলব, সে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই দুর্গ সুরক্ষিত করছে—প্রচুর ক্ষমতা হাতে পেলেই যে বিদ্রোহী হবে। উপযুক্ত প্রমাণ জোগাড় করব। বলব, রাজ্যের ওমরাহের সঙ্গে তার যোগ আছে। তখন তার কোন ওমরাহ তার পক্ষে দাঁড়াবে না।

—বাঃ, চমৎকার বুদ্ধি তোমার দাদা। অপূর্ব! সত্যি এই

বুদ্ধি আর একনিষ্ঠতা নিয়ে যদি তুমি ভগবানের স্মরণ করতে দাদা…

—ভুল সন্তোষ, ভুল। এ কিছুই যে আমার নয় ভাই। সব তিনি দিচ্ছেন তিনিই করাচ্ছেন…

সন্তোষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অমরের মুখের দিকে।

এমন সময় একজন ভৃত্য এসে বলে—নীলাচন থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন, তিনি হুজুরের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

শুনে অমর বিচলিত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভৃত্যকে বলে—শিগগীর তাঁকে ভেতরে নিয়ে এস।

একটু পরেই ব্রাহ্মণ প্রবেশ করেন। পরণে সামান্য ধুতি আর উত্তরীয়—হাতে একটি যষ্ঠি। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে অমর বলে—আপনি নীলাচল থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—প্রভুর খবর কিছু জানেন? তাঁর জন্যে আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

—তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন তোমার কাছে।

—তাই নাকি। তাঁর সর্বাঙ্গীণ কুশল ত?

—হ্যাঁ, তিনি এখন নীলাচলেই আছেন। তিনি এই পত্রটি পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।

ব্রাহ্মণ তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্ত থেকে একটা চিঠি বের করে সেটা তুলে দেয় অমরের হাতে।

অমর চিঠিটা পড়ে। সন্তোষও পড়ে। মাত্র একটি সংস্কৃত শ্লোক তাতে লেখা: ‘পরব্যসনিণী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ নবসঙ্গরসায়নম্’

অর্থাৎ পরাধীনা নারী গৃহকর্মে ব্যাপৃত থেকেও যেমন নবসঙ্গ রস অন্তরে আস্বাদন করে, তেমনি বিষয় কর্মে ব্যস্ত থেকেও মনে মনে ঈশ্বরের চরণ ধ্যান করবে।

শ্লোকটি আগাগোড়া বার দুই পড়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অমর—সন্তোষ, সন্তোষ আর আমাদের ভয় নেই ভাই। প্রভু আমাদের স্মরণ করেছেন। আমরা প্রভুর মনের একান্ত সন্নিকটে। মিথ্যাই এতদিন উতলা হয়েছি। প্রভুর ওপর অবিচার করেছি! আমি তোমাদের বলেছিলাম না, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের সময় হলেই স্মরণ করবেন।

সন্তোষকুমারও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

একটু পরে উচ্ছ্বাস কমলে অমর ব্রাহ্মণকে বললেন—আপনি আজ এখানে থাকবেন ত?

—না, আমাকে আজই সন্ধ্যায় ফিরে যেতে হবে।

—বেশ আমার দূত আপনাকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে উড়িষ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে। আপনি এখন আমার এখানে বিশ্রাম করুন।

ব্রাহ্মণ রাজী হলেন।

অমর তখন পাশের ঘরে গিয়ে বার বার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বহস্তে লিখিত শ্লোকটি দেখেন আর সেটি বুকে জড়িয়ে ধরেন।

অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে তাঁর বুককে সিক্ত করে তোলে।

॥ এগার ॥

অগণ্য লোকের সাথে শ্রীমন্ মহাপ্রভু চলেছেন বৃন্দাবনের পথ ধরে।

গঙ্গার ধারে ধারে পথ। পৌষ মাস, দারুণ শীত। কিন্তু সে শীত কেউ অনুভব করতে পারে না। যেখানে কীর্তন হয়, কৃষ্ণনামের রোলে দশ দিক মধুময় হয়ে ওঠে সেখানে প্রকৃতিও হয় স্তব্ধ। শীত থাকতে পারে না সেখানে।

কীর্তন চলে, তার সঙ্গে চলে নৃত্য।

বিপুল আনন্দে ঘন ঘন হরি ধ্বনিতে দিক্ দিগন্ত মুখরিত করে অসংখ্য ভক্তের সঙ্গে প্রভু চলেছেন।

যে গ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁরা চলেন, দলে দলে লোক এসে ভিক্ষা দেয়। যে ধনী সে অকুণ্ঠ চিত্তে দান করে। যে কাঙাল, সে ভিক্ষা করেও ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা দিয়ে নাম প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গ্রামবাসীরা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে।

এই ভাবে জনস্রোত বাড়তে বাড়তে বিপুল আকার ধারণ করে। অবশেষে সে উদ্বেল জনতরঙ্গ এসে আছাড়ে পড়ে গৌড়ের দ্বারে।

এইভাবে প্রভু এলেন রামকেলিতে। সেখানে একটি তমাল গাছের তলে তিনি আসন করলেন।

লক্ষ লোকের কলরব-ধ্বনি গিয়ে পৌঁছুল সুলতানের কানে। সুলতান হোসেনশাহ মন্ত্রী কেশব ছত্রীকে বললেন—ব্যাপার কি, দেখে এস।

কেশব ছত্রী বললেন—আমি দেখে এসেছি জাঁহাপনা। একজন হিন্দু ফকীর তাঁর হাজার হাজার শিষ্য নিয়ে চলেছেন বৃন্দাবনের পথে।

সুলতান আশ্চর্য হয়ে বললেন—সে কি, ফকির তাদের কি খেতে দেয় ?

কেশব বললেন—ফকীর নিজে ভিক্ষুক, তিনি অপরের আহার্য কোথায় জোগাড় করবেন ?

কথাটা সুলতানের বিশ্বাস হলো না। তিনি শহর কোতোয়ালকে ডেকে বললেন—যে হিন্দু ফকীর রামকেলীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

কোতোয়াল বলল—এ হিন্দু ফকীর সামান্য মানুষ নয় জাঁহাপনা। ইনি যখন গান করেন, তখন সব বৃক্ষ মাথা নুইয়ে প্রণাম করে।

সুলতান আরও বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—ফকীর দেখতে কেমন ?

কোতোয়াল তখন প্রভুর রূপ বর্ণনা করলেন :

জিনিয়া কনককান্তি প্রকাণ্ড শরীর
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগম্ভীর।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ, কমল নয়ান
কোটি চন্দ্র সে মুখের নহেক সমান।...
অরুণ কমল যেন চরণ যুগল
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্মল।

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত; বৃন্দাবন দাস)

সুলতান চমৎকৃত হলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করতে না পেরে তিনি সাকর মল্লিককে ডেকে পাঠালেন। অমরনাথ এলে সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন—এই হিন্দু ফকীর কে ?

—আমার বিশ্বাস ইনি স্বয়ং ভগবান।

সুলতান হেসে বললেন—ভগবান ? কিন্তু আল্লা হিন্দুর বেশে আসবেন কেন ?

—আল্লার কাছে জাত নেই, বেশভূশা নেই, সব সমান। তিনি কখন কোন্ বেশে আসেন তা জগতের কম লোকই জানতে পারে।

—শুনেছি ফকীরের এক কপর্দকও সংস্থান নেই তাহলে এত লোককে তিনি খাওয়ান কি করে ?

অমরনাথ একটু হাসলেন। কোন ও উত্তর দিলেন না। বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল—যে ভাণ্ডার থেকে তিনি আপনাকে আমাকে জগতের কোটি কোটি লোককে খাওয়াচ্ছেন। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলেন না।

সুলতান বললেন—আমায় এত ভৃত্য এত সৈন্য সামন্ত আছে কিন্তু তিন মাস তাদের মাইনে না দিলে তারা আমার নোকরী ছেড়ে দেবে। এমন কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এই নগন্য ফকীর যার কাউকে কাণাকড়ি দেবার সামর্থ্য নেই, তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে আজ্ঞাবহ হয়ে চলেছে। আচ্ছা তাজ্জব বাত…

—কড়ির চেয়ে বড় একটা জিনিস আছে জাঁহাপনা।

—কি সে জিনিষ ?

—ভগবানের নাম।

—আমরাও ত মসজিদে গিয়ে আল্লার নাম নিই।

—দুই ধরে থাকলে হবে না জাঁহাপনা—হয় আল্লা নয় ধন দৌলত টাকা পয়সা।

—তবে কি তুমি বলতে চাও, আমরা যে আল্লাকে এত ডাকছি সব বৃথা যাবে।

না জাঁহাপনা তাঁর নাম কখনও বৃথা হয় না। তাঁর নাম নিলে একদিন তার ফল নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু কড়ি ধরে থাকলে আল্লাকে পাওয়া যায় না। আমি এখন ভগবানকে ভুলে

আপনার নোক্‌রি করছি, কিন্তু যেদিন তিনি মেহেরবাণী করে আমাকে ডাকবেন সেদিন আপনার নোক্‌রিতে ইস্তফা দিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে যাব।

বিস্মিত সুলতান বললেন—তুমি এই উজিরী পদ, এই ধন দৌলত সব ছেড়ে কখনও যেতে পার সাকর মল্লিক?

—যদি পারি সুলতান, আমায় ছুটি দেবেন?

—তা বলতে পারি না, আমার মনে হয় তোমায় ছাড়লে আমার রাজ্য চলবে না। তোমার বুদ্ধি কৌশলে আমার রাজ্যের এই শ্রীবৃদ্ধি।

আমি আর কি করেছি সুলতান, আমার মত আপনার শত শত গোলাম আছে।

—তা নেই সাকর মল্লিক। তুমি যদি ইসমাইল গাজীর চক্রান্ত ধরে না দিতে তা হলে যে আজ আমায় মেরে সিংহাসনে বসত। সে যে রকম অসংখ্য বন্ধু ও সৈন্য নিয়ে প্রবল হয়েছিল তার গায়ে হাত দিতে আমার সাহস হতো না। তুমি অদ্ভুত কৌশলে মুহূর্তে তাকে ধ্বংস করলে।

—সে যাই হোক জাঁহাপনা, আমার আবেদন রইল, ছুটি চাইলে ছুটি পাব।

—তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই দেব উজীর সাহেব, কিন্তু ছুটি দিতে পারব না।

সাকর মল্লিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুলতানের কাছে বিদায় নিয়ে দরবার ত্যাগ করলেন।

পথ দিয়ে চলেছেন তিনি। তাঁর পিছনে শত অশ্বারোহী তাঁর শরীর রক্ষীরূপে চলল। তাঁর অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কিন্তু অন্তর দীনাতিদীন। দর্শকেরা ভাবছিল উজীর সাহেব কত বড়, সাকর মল্লিক ভাবছিলেন তিনি কতো তুচ্ছ, কতো দীন, কতো কাঙাল!

উজীর প্রস্থান করলে সুলতান কেশব খাঁকে বললেন—আমি একবার এই হিন্দু ফকীরকে দেখতে ইচ্ছা করি।

কেশবের ভয় হলো পাছে সুলতান প্রভুর অনিষ্ট করেন। কৌশল করে বললেন—আজ থাক, কাল তাঁকে এক সময় নিয়ে আসব।

—বেশ তাই হবে। আমার রাজ্যে তিনি অতিথিরূপে এসেছেন আমি তাঁকে বিরক্ত করব না। অন্য কাউকে করতেও দেব না।

তবু সুলতানের হিন্দু কর্মচারীরা নিরুদ্বেগ হলেন না। প্রভুকে শীঘ্র রামকেলী ছেড়ে যাবার জন্য অনুরোধ করবেন স্থির করলেন।

॥ বার ॥

গভীর রাত।

প্রভু ভাবে বিভোর।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাজন ও বৈষ্ণবেরা প্রভুকে বেষ্টন করে তমালবৃক্ষ তলে উপবিষ্ট। অসংখ্য ভক্তেরা চারিদিকে প্রায় ক্রোশব্যাপী স্থান জুড়ে হরিনাম করছেন।

দারুণ শীত। শীত নিবারণ করবার জন্যে মধ্যে মধ্যে ধুনি জ্বলছে। স্থানে স্থানে কীর্তন চলছে—নৃত্য হচ্ছে। কয়েকটা খোল করতাল কোথেকে এসে গেছে। ঘন ঘন প্রবল হুংকার আকাশ কাঁপিয়ে তুলছে। বিধর্মী রাজার দুয়ারে এসে হরিনাম করতে কারও ভয় ব সংকোচের চিহ্নমাত্র নেই। তাঁরা জানেন, তাঁরা প্রভুর সেবক। সুতরাং অন্য কাউকে ভয় করতে তাঁরা জানেন না।

আহার্য এসেছে প্রচুর।

কে দিয়েছে, কোথেকে এসেছে, সে সংবাদ কেউ রাখেন না। সুমিষ্ট কদলী আর নানান মিষ্টান্নের সাথে দধি আহার করে তাঁরা পরম পরিতৃপ্ত। দাতা কে, যে সংবাদ রাখবার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে প্রত্যেক দাতার উদ্দেশ্যে তাঁরা আশীর্বাদ করেন—তোমার কৃষ্ণপ্রেম হোক!

লক্ষ হৃদয়ের আশীর্বাদ কখনও বিফল হতে পারে না। সেই আশীর্বাদ থেকেই হয়েছিল রূপ-সনাতনের জন্ম।

এদিকে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ ভাবছেন, প্রভু এখানে, এই মুসলমান

রাজধানীতে এসে নিশি যাপন করতে বাসনা করলেন কেন? নিশ্চয়ই তাঁর কোনও নিগুঢ় উদ্দেশ্য আছে! কিন্তু কি সে উদ্দেশ্য?

সমস্ত দিন গেল, রাতও শেষ হতে চলল। প্রভু নিশ্চেষ্ট। অন্যত্র যাবার নামও নেই। ব্যাপার কি? দেখাচ্ছেন এমন ভাব, যেন কিছুই জানেন না তিনি—ভাবে বিভোর হয়ে আছেন। কিন্তু চতুর শিরোমণি এদিকে মতলব ঠিক করেছেন। কিছু রহস্য নিশ্চয়ই আছে—দেখা যাক্!

হঠাৎ নিত্যানন্দ দেখলেন, অদূরে দুটি মনুষ্যমূর্তি। চোরের মত নীরবে, ধীরে ধীরে তমাল গাছের দিকে তাঁরা এগিয়ে আসছেন।

ধুনির কাঠের আলো তত উজ্জ্বল ছিল না। একটি আলোয় নিত্যানন্দ দেখলেন, দুজনেরই খালি পা, নগ্ন অঙ্গ। পরিধানে একটি সামান্য বস্ত্র। বক্ষে যজ্ঞোপবীত।

নিত্যানন্দ উঠলেন। অনুমান করলেন—এই দুজনের জন্যেই হয়ত প্রভু এখানে পদার্পণ করেছেন। তিনি তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেই বললেন—প্রভু তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, এস।

দুই ভাই—অমর,আর সন্তোষ, বিস্মিত হয়ে নিত্যানন্দের দিকে চাইলেন। নিত্যানন্দের মুখে মৃদু মধুর হাসি। তা দেখে দুজনেই অনুমান করলেন, ইনিই বোধ হয় প্রভুপাদ নিত্যানন্দ। তখন তাঁরা দুজন নিত্যানন্দের পায়ে পড়ে হাত জোড় করে বললেন—আমাদের প্রতি কৃপা করুন।

নিত্যানন্দ হেসে বললে—কৃপা করবার আমি কে? কৃপাময় তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন. বলেই নীলাচল থেকে এতদূর এসেছেন। আর তোমাদের ভয় কি?

দুই ভাই বিহ্বল হয়ে পড়লেন। নিত্যানন্দ তখনও তাঁদের পরিচয় অবগত নন—তবু তাঁর স্থির বিশ্বাস, এই দুই ব্যক্তির জন্যেই প্রভু এদেশে এসেছেন। প্রভুপাদ হাসিমুখে প্রভুর কাছে তাঁদের নিয়ে চললেন।

প্রভু বাহ্যজ্ঞান রহিত—প্রেম বিহ্বল। নিত্যানন্দের চেষ্টায় প্রভুর ধ্যান ভাঙল। দুই ভাই তখন প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

যে চরণধূলির কামনায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত ছোটাছুটি করছেন, যে চরণধূলির আশায় শঙ্কর-ব্রহ্মা তৎপর, সেই দেব-দুর্লভ চরণধূলি তাঁরা মাথায় ও জিহ্বায় স্পর্শ করলেন।

ধীরে ধীরে হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হলো। প্রাণের ভেতরে যেখানে হাহাকার উঠছিল, সেখানটা শান্ত ও শীতল হলো। প্রভু করুণাঘন দৃষ্টিতে তাঁদের পানে চাইলেন। বললেন—দৈন্য সংবরণ কর। তোমরা আমাকে যে সব পত্র লিখেছো, তা আমি পেয়েছি। আমার একটা উত্তরও পেয়ে থাকবে।

অমর দু হাত জোড় করে বললেন—প্রভু আমার সে অপরাধ ক্ষমা করো। এবার তুমি জগতে এসেছে শুধু ভালবাসতে—শুধু প্রেম বিলোতে, দণ্ড দিতে নয়। সেই ভরসাতেই আমি তোমায় পত্র লিখতে সাহস করেছিলাম।

প্রভু ঈষৎ হাসলেন। সনাতনের দিকে প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বোঝালেন যে, তাঁর কাছে যে অপরাধ, তা তিনি গ্রহণ করেন না।

অমর বললেন—পাপীকে উদ্ধার করতেই এবার এসেছ প্রভু, কিন্তু আমাদের মতো পাপী আর কোথাও পাবে না।

প্রভু উত্তর দিলেন—কৃষ্ণনাম যার বদনে, তার আবার পাপ কোথায়? সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণনামে।

—প্রভু কৃষ্ণনাম বদনে নেই, হৃদয়ে নেই। সেখানে আছে শুধু হাহাকার। একটা অব্যক্ত বেদনা। অসীম যন্ত্রণা। রক্ষা কর প্রভু, কাঙালদের উদ্ধার কর।

—যখন পাপ চিনেছ, নামের মহিমা বুঝেছ, তখনই ত তোমাদের উদ্ধারের উপায় কৃষ্ণ করেছেন।

—প্রভু, আমরা ঘোর পাপী—এত বড় পাপী তোমার জগাই

মাধাইও ছিল না। তারা মূর্খ নির্বোধ—অজ্ঞানে পাপ করেছে। আর আমরা পাপ জেনে শুনে করেছি। তোমার কৃপা ভিন্ন এ জ্ঞানকৃত পাপ থেকে উদ্ধার নেই।

—কৃষ্ণের কৃপায় তোমরা অচিরে মুক্তিলাভ করবে।

—প্রভুর বাক্য কখনো নিষ্ফল হতে পারে না জানি। কিন্তু যে জিহ্বা কখনও মিথ্যা ছাড়া সত্য বলেনি, সে জিহ্বা কি ভাবে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করবে? যে হৃদয় পরের হিংসা ছাড়া কখনও কারো উপকার চিন্তা করেনি, সে হৃদয় কিভাবে কৃষ্ণ ধ্যানে তন্ময় হবে?

—আজ তোমাদের পুনর্জন্ম হলো। আমি তোমাদের নাম দিলাম সনাতন আর রূপ। এই নামে তোমরা দুই ভাই এরপর পরিচিত হবে। তোমরা কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপ কর—অচিরে কৃষ্ণের কৃপায় তোমরা মুক্তিলাভ করবে।

দুজনের দেহের মধ্যে যেন এক তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হলো। সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্যে যেন সেই শক্তি প্রবেশ করল। তাঁদের কে ঠেলে উঠিয়ে দিল যুগান্তের মোহনিদ্রা ভেঙে। এক অপার্থিব ভক্তির বন্যায় তাঁদের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। অসীম আবেগভরে তাঁদের দেহ কেঁপে উঠল।

রূপ (সন্তোষ) এতক্ষণ নীরব ছিলেন। গলায় বস্ত্র জড়িয়ে যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রভুর দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এখন তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—একি, আমার প্রাণের ভেতর এমন করছে কেন? কোথা থেকে একটা অসীম শক্তি এসে যেন আমাকে কাঁপিয়ে তুলছে। যে জিহবা কখনও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেনি, সেই জিহবা যেন কৃষ্ণনাম নিয়ে ছুটে চলেছে। আমার প্রাণের ভেতর কে যেন একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সব আলো করে দিল। বাঁশী হাতে ও কে আমার সামনে এসে দাঁড়াল? আহা, কি অপরূপ রূপের মাধুরী! সারা আকাশের অনন্ত নীল যেন এর অঙ্গের সুষমা। নীলবর্ণ কি এত সুন্দর! এত উজ্জল! এত জ্যোতির্ময়? নীল মুখে কি

অপূর্ব হাসি! দৃষ্টি ত নয়—যেন করুণার প্রবাহ! অমৃত ধারায় জগৎ প্লাবিত করে ছুটে চলেছে। আহা কি আনন্দের তরঙ্গ এসে আমায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। আকাশ, পৃথিবী, আমার চারিদিক সে তরঙ্গের দোলায় মধুময় হয়ে উঠেছে। ওগো একটু দাঁড়াও, আরও ভাল করে তোমায় অনুভব করি। হৃদয় উজাড় করে তোমাকে উপলব্ধি করতে দাও।

বলতে বলতে রূপ প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রভু তাঁর পদ্ম হস্ত রূপের মাথায় স্পর্শ করলেন। রূপ প্রভুর চরণ ধূলি নিয়ে উঠে বসলেন। প্রভু বললেন—রূপ, তোমায় কৃষ্ণ কৃপা করেছেন—অতি সত্বর তুমি সব বন্ধ থেকে মুক্তিলাভ করবে।

সনাতন এতক্ষণ অবিরাম কাঁদছিলেন। কেন কাঁদছিলেন তা তিনি জানেন না, কিন্তু কান্নার বিরাম নেই। অশ্রুজল ধরণীকে সিক্ত করছে। প্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তোমরা আমার অতি প্রিয়।

সনাতন হাত জোড় করে বললেন—প্রভু পাপী মাত্রেই তোমার প্রিয়, নইলে তোমার পতিত পাবন নামে যে কলঙ্ক হবে।

প্রভু বললেন—সনাতন, তোমার দৈন্যপূর্ণ চিঠি পেয়ে আর স্থির থাকতে পারিনি—নীলাচল হতে ছুটে এসেছি।

—তোমায় ডাকলে কি তুমি থাকতে পার প্রভু? আমি তোমায় এত দুঃখ দিয়ে অতদূর থেকে আনতাম না—কিন্তু আর আমাদের কে আছে নাথ? আর কাকে ডাকবো! তুমি যে আমাদের জন্যই ধরায় এসেছ। আমি কৃষ্ণ জানি না, ভগবান জানি না, জানি শুধু তোমাকে। আমার প্রেমময় করুণাঘন গৌরহরিকে। প্রভু তোমার এ দাসকে চরণে স্থান দাও—আর যে আমার কেউ নেই।

—ঠিক সময়ে কৃষ্ণ কৃপা করবেন, নির্ভয়ে থাক। অন্তরে যে একবার তাঁকে ডেকেছে, তার আর ডোবার ভয় নেই, সেই নামই

তাকে রক্ষা কর'বে। আর সে যদি কর্মদোষে বিপথে যায়, কৃষ্ণ তাকে তুলে ধরে সৎপথে নিয়ে আসবেন।

—প্রভু এই কথা যেন স্মরণ থাকে।

প্রভু মৃদু হাসলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর সনাতন প্রশ্ন করলেন—প্রভু কি এই একলক্ষ লোক নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছেন ?

—তাই ত দেখছি, অনেক লোক সঙ্গ নিয়েছে।

—জনতা ক্রমে বাড়তেই থাকবে।

—সে কথা সত্য। আমি তবে নীলাচলেই ফিরে যাই।

রূপ বললেন—প্রভুর অনুমতি হয় ত আমিও প্রভুর সঙ্গে যাই

প্রভু বললেন—না রূপ, এখন নয়, সময়ে যেয়ো।

—আবার কবে প্রভুর দর্শন পাব ?

—সত্বরই কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করবেন।

অরুণোদয়ের আভাষ দেখা গেল দিগান্তের ভালে। শোনা গেল বিহগ কাকলী। দুই ভাই প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

প্রভু তখন নিত্যানন্দকে বললেন—এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া ঠিক নয়। সনাতনের মুখ থেকে কৃষ্ণের আদেশ পেলাম চল, আমরা নীলাচলেই ফিরে যাই।

নিত্যানন্দ একটু হেসে বললেন—জানি, তুমি এখান থেকেই ফিরবে বৃন্দাবন যাত্রা ত তোমার ছল মাত্র!

॥ তের ॥

প্রভু গৌড় ছেড়ে চললেন।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জন্মভূমি খেতুরির কিছু দূরে পদ্মা পার হয়ে প্রভু এলেন অগ্রদ্বীপ। সেখানে গোবিন্দকে কৃপা করে এলেন শান্তিপুরে। জননীর শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করে দ্রুত চললেন নীলাচলের পথে।

প্রভুপাদ নিত্যানন্দকে প্রভু সঙ্গে নিলেন না। তাঁকে বাঙলায় রেখে গেলেন হরিনাম প্রচারের জন্য। প্রভুপাদ বর্তমান কোলকাতার কাছে পানিহাটি গ্রামে ভক্ত রাঘবের বাড়িতে অবস্থান করে হরিনামের বন্যায় দেশকে প্লাবিত করে তুললেন।

সপ্তগ্রাম থেকে তা শুনলেন ভক্ত রঘুনাথ। তিনি তখন গৃহী। পিতার অনুমতি নিয়ে, রঘুনাথ পানিহাটিতে চললেন নিত্যানন্দকে দেখবার ইচ্ছা বুকে নিয়ে।

নৌকায় চড়ে তাঁরা পানিহাটির নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, এক বিপুল জনপ্রবাহ গঙ্গার তীর ধরে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। নৌকা আরও নিকটে এল। রঘুনাথ দেখলেন. একজন সন্ন্যাসী রূপে দশদিক আলো করে গঙ্গার ধারে ধারে পথ বেয়ে চলেছেন। তিনি ধীরে ধীরে কি একটা গান করছিলেন—দূর থেকে তা স্পষ্ট শোনা গেল না।

কিছু পরে নৌকা তীরে ভিড়লো। রঘুনাথ ঘাটে নেমে এগিয়ে চললেন। দেখলেন নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদ গান গাইতে গাইতে চলেছেন। তাঁর চরণে নূপুর, নয়নে বারিধারা, মুখে অপার্থিব সুমিষ্ট নাম। তিনি নাচছেন আর গাইছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

কেউ নাম নিচ্ছে, কেউ নিচ্ছে না। যে নাম নিচ্ছে সে নৃত্য-গীতে যোগ দিচ্ছে। যে পাষাণ, সে শুধু মজা দেখতে দেখতে চলেছে। কেউ হাসছে, কেউ বা বিদ্রূপ করছে। একজন এগিয়ে এসে প্রভু-পাদকে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, নাম নিয়ে কি হবে।

—গোলোকে যাবে।

—স্ত্রীপুত্র নিয়ে গোলোকে যাব? সেখানে কি সব খড়ের ঘর?

প্রভুপাদ তার ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললেন—ভাই, একবার গৌর বল।

লোকটা উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমি ওই নাম নিয়ে গোল্লায় যাই, আর আমার বৌ ছেলে এদিকে কষ্ট পাক্। ও সব হবে না ঠাকুর। এমন সোনার সংসার ছেড়ে—

—একদিন ত ছাড়তে হবে ভাই—

—তার এখনও ঢের দেরী। তাছাড়া তোমার নাম নিলেই যদি অত সহজে উদ্ধার হতাম তবে আর ভাবনা ছিল না!

—আচ্ছা, এমনি একবার বল না! বল—গৌর গৌর…

—গৌর গৌর, গৌর গৌর—বাঃ, বেশ ত নামটা, বার বার নিতে ইচ্ছে করে। গৌর গৌর—

এমন সময় আর একটি লোক এগিয়ে এসে বলল—আচ্ছা ঠাকুর তুমি গোলোক দেখেছ?

—গোলোক দেখিনি, গোলোক পতিকে দেখেছি। ভাই একবার গৌর বল—

—গোলোকে যেতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই—

—ভাই, গৌর বলে আমায় কিনে নাও!

—তুমি আমার আবার কোন্ কাজে লাগবে তোমায় চিনে নেব। শুধু দিনরাত গৌর গৌর বলে জ্বালাবে ত! কিনা তোমার নামটি বেশ। গৌর গৌর, গৌর গৌর...বাঃ, কি মিষ্ট নাম!

দুজনেই নাম নিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো।

তৃতীয় একটি লোক সগর্বভরে এগিয়ে এসে বললে—ঠাকুর আমি তোমায় চিনে নিতে রাজী আছি।

—তবে হরি বল, কৃষ্ণ বল, গৌর বল—

—বেশ ত! হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কই আমার ত কিছুই হলো না। তবে নামটি বেশ ভাল, আবার বলতে ইচ্ছা হয়। হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কিন্তু তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে—মেয়েটার আবার জ্বর...হরি হরি হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আহা এ আবার কি ফ্যাসাদ হল, ঘরবাড়ি সব তুলে যাচ্ছি শুধু যে নাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঠাকুর, এ তুমি আমার কি করলে? আহা কি মধুর নাম! এ নাম কোথায় ছিল এতদিন?

নিত্যানন্দ আবার বললেন :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
গৌর গৌর গৌর গৌর, গৌর গৌর গৌর হে।

লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে লাগল। করতে করতে সেও প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। বলল—আহা, এ নাম যে, রসনা ছাড়তে চাইছে না। কি অপূর্ব মিষ্টতা—কি মাদকতা! আমার বুকের ভেতরে নাম যে ঠেলে উঠছে! এ আবার কি বিপদ হলো—ছেলে মেয়ে, ঘর-দোর সবই যে ভুলে যাচ্ছি আমি! কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এ তুমি কি করলে ঠাকুর? কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কেন আজ আমার এমন হলো?

নিত্যানন্দ কোনও উত্তর দিলেন না। নাম করতে করতে চলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে করতে সকলে চলল।

এবার আর একটি লোককে আসতে দেখে নিত্যানন্দ তাকেও ধরলেন। বললেন—ভাই, একবার বল!

লোকটি বলল—আমি সাফ বলে দিচ্ছি বাপু, এ সব পাগলামি আমার দ্বারা হবে না। জোয়ান মরদ, সদর রাস্তার ওপর নাচতে আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতে লজ্জা করে না? ছি—দিনরাত শুধু কি এক কৃষ্ণ কৃষ্ণ—

নিত্যানন্দ ব্যাকুল ভাবে বললেন—এই ত বলেছ—আবার বল ভাই, আবার বলো।

—কি বলব?

—যা এইমাত্র বললে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ—

—ছি ছি, একবার ভুল করে বলে ফেলেছি, আর কি বলি?

—আমি তোমার দাসানুদাস, আমার প্রতি কৃপা করে একবার কৃষ্ণ বল—গৌর বল—

—বেশ ত নাচছিলে, কাঁদছিলে—আবার আমায় নিয়ে পড়লে কেন বাপু?

প্রভুপাদ তখন ধূলির ওপর তার চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—আমি মিনতি করছি, ওগো, একবার হরি বল, কৃষ্ণ বল—কৃষ্ণ বলে আমায় জন্মের মত কিনে নাও। আমি দন্তে তৃণ ধারণ করে, হাতজোড় করে বলছি—বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গৌর গৌর—

লোকটি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল।

একজন অপূর্ব তেজসম্পন্ন সন্ন্যাসী তাকে হরিনাম বলাবার জন্যে তার পায়ে পড়েছেন! কেন? এ দৃশ্য সে হিন্দু হয়ে সহ্য করেত পারল না। বলল—এই ঠাকুর ওঠ, বল কি বলতে হবে! তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসে শেষে আবার কি বিপদে পড়ব! তুমি যাদু জান ঠাকুর—

নিত্যানন্দ আবেগ ভরে বললেন—না ভাই, এ যাদু নয়, এ তামাসা নয়, এ নামের মহতী শক্তি। নাম নামী যে অভেদ। যেখানে নাম, সেখানেই তিনি। বল ঃ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে,
রাম রাম রাম রাম, রাম রাম রাম হে।

লোকটিও নাম করতে লাগল।

নাম করতে করতে বলল—বাঃ, বেশ নাম ত। আচ্ছা, নাম করতে করতে বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে কেন? কি যেন বন্ধ ছিল, খুলে গেল। চোখে জল আসছে কেন? যেন অবিরাম প্রাণভরে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছে করছে। ওগো, আমায় জিহ্বা করে দাও—আমি জিহ্বা হয়ে দিনরাত নাম উচ্চারণ করি, যেন দিনরাত আমি ওই নাম শুনে বিভোর হয়ে যেতে পারি। যেন আকাশ পটে প্রতিটি গ্রহ তারার এই নাম চিহ্নিত দেখি…

নিত্যানন্দ প্রভু অকস্মাৎ সুগভীর হুঙ্কার দিয়ে উঠে লোকটির কম্পিত দেহ বাহুমধ্যে ধারণ করে তাকে আলিঙ্গন করলেন। সেও তখন নাচতে নাচতে, কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গে সঙ্গে চলল।

এইভাবে সারাদিন নিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করে ফিরলেন। অপরাহ্নে এলেন রাঘবের বাড়িতে।

ভক্ত রঘুনাথ তাঁর জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রভুপদের শ্রীচরণ বন্দনা করলেন।

প্রভুপাদ এর আগে ছুএকবার রঘুনাথকে দেখেছেন, তাঁকে চিনতেন। তিনি রঘুনাথকে সাদরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

একটু পরে রঘুনাথ বললেন—আচ্ছা হরিদাসকে ত দেখছি না। তিনি কোথায়?

প্রভুপাদ বললেন—তিনি নীলাচলে আছেন।

রঘুনাথ বললেন—শুনেছিলাম নীলাচলে যবনের প্রবেশাধিকার নেই।

নিত্যানন্দ বললেন—প্রভুর ইচ্ছায় সবই হয়। হরিদাসের মনের ইচ্ছা জেনে প্রভু তাঁকে নীলাচলে যেতে বলেছিলেন। তা ছাড়া হরিদাস যবন নন। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান, যবনের অন্নে পালিত। যদি যবনও হতেন, তা হলেও তিনি পরম পবিত্র। তাঁর চরণস্পর্শে তীর্থ পবিত্র হয়।

রঘুনাথ মনে মনে হরিদাসকে ধ্যান করে ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁকে প্রণাম করলেন।

প্রভুপাদ বললেন—রঘুনাথ আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, আমার সব পার্ষদরাও তাই—তুমি এঁদের জন্যে প্রচুর প্রসাদের ব্যবস্থা কর—

রঘুনাথ আনন্দে নৃত্য করে উঠে বললেন—আমার কি অপূর্ব সৌভাগ্য!

সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ আদেশ দিলেন। দ্রুত সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো। দলে দলে লোক ছুটে গিয়ে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, আম, কদলী ইত্যাদি আহার্য বস্তু ভারে ভারে নিয়ে এলো।

রাঘবের বাড়ি গঙ্গার ধারেই। তার পাশে বিরাট প্রাঙ্গণ। বট অশ্বত্থের ছায়ায় সুশীতল। গঙ্গা থেকে প্রবাহিত বাতাসে সকলের মন প্রফুল্ল। কত নিমন্ত্রিত আর কত শত অনিমন্ত্রিত ভক্ত এসে সেখানে জমলেন।

ঠাকুরকে সমস্ত প্রসাদ নিবেদন করে সব বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী নিয়ে প্রভুপাদ পঙ্গতে বসলেন। সব ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হলো।

ঠিক মধ্যস্থলে দুখানি আসন পাতা হলো। একটিতে বসে নিত্যানন্দ মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ হলেন। বোধ হয় শ্রীমম্ মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করলেন।

মহাপ্রভু তখন নীলাচলে—কিন্তু নিত্যানন্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে

তাঁকে আসতে হলো। হাজার হাজর লোকের চোখের সাম্‌নে তিনি অন্য আসনটিতে ভোজন করতে বসলেন।

তা দেখে ভক্তরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগল। সকলের চোখে অশ্রু।

নিত্যানন্দ অনেক কষ্টে সকলকে শান্ত করে আবার আহারে বসালেন।

সব বৈষ্ণব মহানন্দে একসঙ্গে হরিধ্বনি করতে করতে পঙ্গতে বসে আহার করতে লাগলেন।

ভোজনে বসেননি শুধু রঘুনাথ।

তিনি দূরে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেই অপূর্ব দৃশ্য যুক্তকরে, গলদশ্রুলোচনে তিনি প্রভুকে দেখছিলেন।

এগিয়ে এলেন নিত্যানন্দ আহার শেষ করে। রঘুনাথের পিঠে হাত দিয়ে বললেন—আর কান্না কেন রঘুনাথ। প্রভু স্বয়ং তোমার ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

রঘুনাথ আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

॥ চৌদ্দ ॥

কার্তিক মাস। শীত ভালভাবে পড়েনি। তবে বাতাসে হিমের পরশ লেগেছে।

একদিন প্রভাতে রূপ আর সনাতন পদব্রজে চলেছেন গঙ্গাস্নানে। তখনও সূর্যদেব আকাশে দেখা দেননি। তবে আকাশের বুকে ঈষৎ রক্তিম ছোঁয়া লেগেছে। পৃথিবীর মানুষ তখনও জাগেনি, তবে দু চারজন সবে জেগে উঠেছে উষা দেবীকে দর্শন করবার জন্যে। পথে জন কোলাহল নেই—কিন্তু গাছের মাথায় পাখীদের কলরব সুরু হয়েছে।

মন্ত্রিদের সঙ্গে পাইক নেই, কেবল জন দুই ভৃত্য। কাপড়চোপড় নিয়ে তারা পেছনে দূরে দূরে আসছিল। রূপ বললেন—দাদা এরকম করে ত আর দিন যায় না—আর যে পারি না।

সনাতন বললেন—ধৈর্য ধর ভাই। প্রভু যখন বলেছেন, আমরা সত্বর মুক্তিলাভ করব, তখন তুমি মিথ্যা কেন চিন্তা কর।

—চিন্তা যে অনেক দাদা। জীবন যে অবিরাম বয়ে চলেছে। মানুষের আয়ু আর কতটুকু! চিন্তা তাই ত্যাগ করতে পারছি না কিছুতেই। দিনের পর দিন হিসেব মিলিয়ে দেখি, আয় কিছু নেই, ব্যয় অনেক বেশি।

—কিসের ভয় ভাই? মস্ত বড় যে আয় করে নিয়েছ, তাত আর নষ্ট হবার নয়।

—কি আয় দাদা?

—প্রভুর চরণ ধুলি মাথায় নিয়েছ, তবে আর ভয় কি ?

—আমি যে আর প্রভুকে ছেড়ে থাকতে পারছি না দাদা। প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছা হচ্ছে নীলাচলে ছুটে যাই।

—তাঁর আদেশ না হলে ত যেতে পার না।

—তিনি কেন ডাক দিয়ে নিচ্ছেন না দাদা ?

—বোধ হয় সময় হয়নি আমাদের।

—তবে তুমি প্রাণভয়ে ডাক না কেন দাদা। তেমন করে ডাকলে পরে তিনি কি আর স্থির থাকতে পারেন ?

—ভক্তে ডাকলেই তিনি অস্থির হন। তাই বলে কি ভক্তের উচিত তাঁকে কষ্ট দেওয়া ? তাঁর যা মন চায় তিনি তাই করুন. আমরা সানন্দে ইচ্ছাময়ের আদেশ মাথা পেতে নেব।

—আচ্ছা দাদা, আজও প্রভু নীলাচল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গেলেন না কেন ? গত বছরও তিনি এ সময় নীলাচল ছেড়ে যাত্রা করেছিলেন।

সনাতন হাসলেন।

বললেন—আমার কি বিশ্বাস শুনবে রূপ ? আমার ধারণা প্রভূ নীলাচল ত্যাগ করেছেন।

রূপ বললেন—তিনি নীলাচল ত্যাগ করলে আমাদের চরেরা এসে সংবাদ দিত। চারজন লোকে শ্রীক্ষেত্রে বসে রয়েছে প্রভুর সংবাদ আনবার জন্যে। একজনও অন্তত ছুটে এসে খবর দিত।

—শীঘ্রই সে সংবাদ পাবে রূপ।

—তুমি কেমন করে জানলে দাদা ?

—আমি ধ্যানে দেখেছি, প্রভু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছেন। রূপ বিস্ময়ে স্তব্ধ হলেন।

ভাবলেন, তিনিও কেন ধ্যানে প্রভুর দর্শন পান না ? দুজনে এসে গঙ্গাতীরে দাঁড়ালেন।

সনাতন বললেন—দেখ রূপ, প্রভুর চরণরজ আর এই গঙ্গাবারি যার মাথায়, তার আর কোনও চিন্তা নেই।

দুজনে জলে নামলেন। স্নানাদি শেষ করে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে দুজনে সূর্য প্রণাম করলেন। তারপর করলেন গঙ্গাস্তব—'দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে'…

স্নান শেষ করে তীরে উঠে দেখলেন তাঁদের পাঠান চর চার-জনের মধ্যে একজন ভৃত্যদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

রূপ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি সংবাদ?

—প্রভু নীলাচল ত্যাগ করেছেন।

—কবে? কোন পথে? সঙ্গে কে আছেন?

এতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে শুনে চর একটু চিন্তা করে বলল—বিজয়া দশমীর দিনে শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল পথে বৃন্দাবনের দিকে চলেছেন। সঙ্গে আছেন বলভদ্র নামে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ। কাউকেই তিনি আগে জানান নি, কাউকে সঙ্গে নেননি।

রূপ তরকে পুরস্কারের আশা দিয়ে বিদায় দিলেন। পরে দুজনে কাপড় ছেড়ে বাড়ির দিকে চললেন। ভৃত্য দুজন গঙ্গায় নেমে স্নান করতে লাগল।

রূপ বললেন—দাদা এবার আমি চললাম।

সনাতন বললেন—হৃদয়ে যদি পূর্ণ বৈরাগ্য জেগে থাকে তবে আমি বাধা দেব না—স্বচ্ছন্দে যাও।

—তুমি যাবে না দাদা?

—এখন নয়।

—কেন?

—সুলতানকে না বলে আমি যেতে পারব না। তিনি আমার ওপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁকে সব বুঝিয়ে না দিয়ে আমি কোনও মতেই যেতে পারব না।

রূপ বললেন—তুমি কি আশা কর, সুলতান তোমায় ছুটি দেবেন ?

—সে আশা করি না, তবে বলে যাব। চোরের মত পালাতে রাজী নই আমি।

—তবে আর তোমার যাওয়া হবে না।

—তুমি অগ্রসর হও, আমি পেছনে যাচ্ছি। প্রভু যখন আমাকে ডাকবেন, তখন আমায় কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না।

—তবে কি আমি একা বৃন্দাবনে যাব ?

—না, অনুপকে সঙ্গে নাও। তোমার আর আমার টাকাকড়ি যা আছে সব সঙ্গে নাও।

—সে কি, টাকা নিয়ে কি করব ? সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছি এখনও অর্থ ?

—অর্থ নিয়ে তোমাকে বৃন্দাবনে যেতে বলছি না, দেশে যেতে বলছি। সেখানে অর্থ রেখে অনুপকে নিয়ে বৃন্দাবনে যেয়ো।

—এত অর্থ নিয়ে কি হবে ?

—অনেক কাজ হবে। তোমার বা আমার কোন সন্তান নেই —অনুপের ছেলে শ্রীজীবই আমাদের একমাত্র বংশধর। তার এত অর্থে প্রয়োজন নেই। তাকে কিছু দিয়ে দেশে বসাবে আর বাকি টাকা দেবকার্যে ব্যয় করবে। নিজের জন্যে এক কড়িও রেখো না। সত্বর কাজ শেষ করে বৃন্দাবনে যাও। আমি এ দিকে সুলতানকে বুঝিয়ে রাখব, তুমি দেশে গেছ, আবার ফিরবে।

রূপ বলল—আচ্ছা।

হঠাৎ পথের পাশে কে যেন কাতরকণ্ঠে ডাকল—বাবাগো।

দুজনে থম্‌কে দাঁড়ালেন।

আবার চীৎকার শোনা গেল—বাবা গো মরে গেলাম গো !

দুজনে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলেন। নদীর ধারে আম গাছের জঙ্গল। কিছুদূর গিয়ে দুজনে দেখলেন, এক শীর্ণ বৃদ্ধা অর্ধশায়িত অবস্থায় কাঁদছে।

বৃদ্ধা অতি কুৎসিৎ আকৃতির। অর্ধদগ্ধ। পরনে যে কাপড়টি আছে ছেঁড়া, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত।

সনাতন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়ে ছে। মা ?

—সাপে কেটেছে বাবা।

—কই দেখি।

—আমাকে ছুঁয়ো না বাবা।

—কেন মা ?

—আমি ছোট জাত—মেথর !

—তুমি যে আমার মা।

—আমি অশুচি।

—মা কি কখন অশুচি হয় ?

বৃদ্ধা নীরবে সনাতনের দিকে চেয়ে রইল।

সনাতন নিজের উত্তরীয় দ্বারা বৃদ্ধার অর্ধনগ্ন দেহ আবৃত্ত করে ক্ষত পরীক্ষা করলেন।

দেখলেন ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সনাতন তখন কালবিলম্ব না করে ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে উদ্যত হলেন।

রূপ তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে নিলেন।

রক্ত টেনে ফেলে দিয়ে রূপ মুখ তুললেন।

সনাতন বললেন—আর কোনও ভয় নেই মা, এখন আমাদের ঘরে চল, পরে সুস্থ হলে তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

দুই ভাই বৃদ্ধাকে সযত্নে বয়ে নিয়ে চললেন। সনাতনের বাড়ী কাছেই, দুজনে ধরাধরি করে বৃদ্ধাকে এনে ঘরে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিলেন

চারিদিক থেকে দাসদাসী ছুটে এলো। রূপ তাদের ভিড় করতে নিষেধ করলেন।

সনাতনের সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি যে উত্তরীয় দিয়ে বৃদ্ধাকে ঢেকে দিয়েছিলেন সেই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন অবশেষে তিনি হঠাৎ কেঁদে উঠলেন।

রূপও তাকালেন শয্যার দিকে। তারপর সনাতনের দিকে। দেখলেন সনাতনের দেহ কাঁপছে, বক্ষ অশ্রুপ্লাবিত। ব্যস্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে দাদা ?

সনাতন আঙুল দিয়ে শয্যা দেখিয়ে দিলেন। রূপ উত্তরীয়টি টান দিলেন। দেখলেন উত্তরীয়ের নীচে বৃদ্ধার দেহ নেই। রূপ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন।

সনাতন হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে শয্যার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—প্রভু, তুমি সত্যই দয়াময়। কত দয়া তোমার দয়া করে আজ তুমি তোমার ভৃত্য দুটিকে স্মরণ করেছ। আর পরীক্ষা কেন প্রভু ?

রূপ বললেন—প্রভু আর কত পরীক্ষা করবেন দাদা ?

সনাতন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমরা কে ভাই, তিনি পরীক্ষা করছেন। আবার তিনিই শক্তি দিচ্ছেন। পরীক্ষায় পরাজিত হলে সে কলঙ্ক ত তাঁর, সনাতনের নয়।

॥ পনর ॥

একমাস কেটে গেছে।

রূপ গৌড় ত্যাগ করে প্রেমভাগের দিকে গেছেন। ভৈরব নদের তীরে সুন্দর প্রেমভাগ গ্রামের কথা আগেই বলা হয়েছে।

এক মাস ধরে রূপের কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

সুলতান হোসেন শাহ খুবই রেগে উঠেছেন। দবীর খাস নেই, টেঁকশালের অধ্যক্ষ অনুপ নেই, আবার সাকর মল্লিক কাজে অমনোযোগী

সুলতান কেশব খাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—দবীর খানের কোনও সংবাদ পেয়েছ কি?

কেশব খাঁ বললেন—পেয়েছি জনাব, তিনি দেশে আছেন।

—মন্দ নয়। আর অনুপ?

—তিনিও ওঁর সঙ্গে আছেন।

—তা ভাল। আর ওদিকে সাকর মল্লিক দরবেশ হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিন ভাই তিন দিকে চলে গেলে, আমার কাজ চলবে কেমন করে? সহজে আমি মল্লিককে ছাড়ছি না।

কেশব খাঁ নীরব।

সুলতান আবার বললেন—আচ্ছা খাঁ সাহেব, বলতে পার, কোন্ দুঃখে এই সব মানুষ দরবেশ হতে চায়? এই ধন-দৌলত, মান, ইজ্জত, এসব ছেড়ে পথে পথে আল্লা আল্লা করে মানুষ কি খুব সুখ

পায়? কেন ঘরে বসে কি খোদাকে ডাকা যায় না? আমরা কি ডাকছি না?

—জাঁহাপনা মানুষের মাথা না বিগড়ালে দরবেশ হয় না।

—আমারও তাই মনে হয়। তুমি একবার সাকর মল্লিককে ডেকে নিয়ে এসো। তাকে একবার বুঝিয়ে দেখি। আর দবীর খাসকে ধরে আনতে লোক পাঠাও।

কেশব খাঁ সনাতনের অট্টালিকায় গিয়ে দেখলেন, তিনি ভাগবত শুনছিলেন তন্ময় হয়ে। ভাগবত পাঠ করছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীনাথ আচার্য।

শ্রোতাও ছিলেন অনেক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ভক্ত বৈষ্ণব উদ্ধারণ দত্ত, রামদাস বিশ্বাস ইত্যাদি। পাঠ চলছিল ত্রয়োদশ স্কন্ধ। ব্রহ্মার সংশয় মোচন।

পদ্মযোনি ব্রহ্মার মনে একবার খুব সংশয় জন্মাল। ভাবলেন এই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন লোকটি কে? ইনি কি সত্যই ভগবান? আচ্ছা পরীক্ষা করা যাক।

ব্রহ্মার মনে তখনও মোহ রয়েছে—তাই তিনি ত্রিভুবনপতিকে গেলেন পরীক্ষা করতে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ আর রাখাল বালকেরা যখন খেলা করছিলেন তখন তিনি গরুর পাল আর অধিকাংশ বালকদের হরণ করে মায়ায় অভিভূত করে পর্বতের গুহায় তাদের আবদ্ধ করে রেখে-দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বিস্মিত হলেন। তারপর অন্তর্যামী ভগবান সবই জানতে পারলেন। বুঝলেন এ চুরি ব্রহ্মার কাজ।

তখন বিশ্ব আত্মা শ্রীকৃষ্ণ মায়ার প্রভাবে নতুন একদল বালক আর গোবৎস সৃষ্টি করে তাদের নিয়ে ঘরে ফিরলেন। গোপ বালকদের মায়েরা পর্যন্ত বুঝতে পারলো না যে তাদের

প্রকৃত সন্তানের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্ট মায়ার সন্তান তাদের কোলে বসেছে।

এইভাবে মায়া রচিত গোপবালক আর গোবৎসদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এক বছর ধরে লীলা করলেন।

এক বছর পরে ব্রহ্মা ফিরে এসে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ আগের মতই সকলকে নিয়ে খেলা করছে। তা দেখে পদ্মযোনী ভাবলেন এ কি করে সম্ভব? গোকুলের সব গাভী আর গোপ বালকেরা মায়ায় অভিভূত—তবে এরা এলো কি করে?

তখন পদ্মযোনীর ভ্রম দূর হলো। তিনি তখন ভাবলেন, এই বিশাল অনন্ত শক্তিময় যে পরম পুরুষ তার কাছে তিনি কতটুকু?

এতদূর পর্যন্ত ভাগবত পাঠ হয়েছিল, এসব সময় কেশব ছত্রী সেখানে উপস্থিত হলেন। কেশব বললেন—উজীর সাহেব, সুলতান আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

সনাতন বললেন—তাঁকে বলুন এখন আমার অবসর নেই।

—এই কথাই কি তাঁকে বলব?

—আপনার যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

বেশ, তাহলে বলব, আপনি অসুস্থ, তাই আসতে পারলেন না।

সনাতন তাঁর দিকে আর লক্ষ্য না করে বললেন—আচার্য মহাশয়, পাঠ বন্ধ করবেন না।

শ্রীনাথ আচার্য আবার বলতে সুরু করলেন—ব্রহ্মা কোন কোন মতেই স্থির করতে পারলেন না কোন্‌গুলি আসল আর কোন্‌গুলি মায়ার প্রভাবে ঘটেছে। বিশ্বমোহনকে মোহিত করতে গিয়ে তিনি নিজেই মোহিত হয়ে গেলেন। মোহগ্রস্ত ব্রহ্মা তখন দর্শন করলেন বৎস আর বৎস পাল সবই মেঘের মত শ্যামবর্ণ। সকলেরই পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলের হস্ত

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম। সেই সব মূর্তির অপরিসীম তেজে ব্রহ্মার সব ইন্দ্রিয় যেন নিস্তেজ হয়ে গেল।

আবার পাঠে বাধা পড়ল।

এবারে এসে বাধা দিলেন রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাস। তিনি ভক্ত ও পদকর্তা নরহরি ঠাকুরের জ্যাঠতুতো ভাই। শুধু তাই নয়, তিনি প্রভুর মহাভক্ত রঘুনন্দনের বাবা। সুলতানের তিনি প্রিয় চিকিৎসক।

সুলতান তাঁকে পাঠিয়েছেন উজীর সাহেবের রোগের চিকিৎসার জন্য। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার ব্যাধি কি সনাতন ঠাকুর?

সনাতন বললেন—তুমি বৈদ্য, রোগ নির্ণয় তুমিই করবে।

—মানসিক ব্যাধি আমরা নির্ণয় করতে পারি না।

—আমার কোন জাতীয় ব্যাধি?

—মানসিক।

—তার প্রতিকার করতে পার কি?

—না আমি পারি না—বৈদ্যের কাজ দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসা।

—বেশ, তাহলে এসেছ কেন?

—সুলতান পাঠিয়েছেন।

—আচ্ছা, এখন তবে যাও।

মুকুন্দের ইচ্ছা হলো, তিনি সনাতনকে একটু পরীক্ষা করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—তবে আমি সুলতানকে বলিগে, যে আপনি রোগশূন্য, অথচ রোগের ভান করে পড়ে আছেন।

সনাতন গর্জে উঠলেন।

বললেন—ভান, ভান দেখছ মুকুন্দ দাস? প্রহরি! না, তুমি মুকুন্দ, আর এ রকম কথা বলো না।

এই বলে তিনি মনে মনে ভাবলেন—ছি, আজও প্রবৃত্তির এত

তেজ! এ আত্মাভিমান না গেলে ত প্রভুর কৃপালাভ হবে না। আমিই তাই পড়ে রইলুম। রূপ আর অনুপ চলে গেল।

মুকুন্দ দাস হাসতে হাসতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—আপনি এখনও ব্যাধি মুক্ত হতে পারেননি উজীর সাহেব।

গুপ্ত ক্ষতে কে যেন আঘাত করল। সনাতন আচার্য্যকে বললেন—আজ পাঠে বড় ব্যাঘাত ঘটছে—পাঠ বন্ধ করলেই ভাল হয়।

আচার্য বললেন—ব্রহ্মার মোহনাশটা সংক্ষেপে সেরে নিই।

আচার্য সুরু করলেন—সেই, অখণ্ড, অনন্ত তেজের সামনে যখন ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হলো তখন সেই জন্মরহিত, বাণীর অধীশ্বর পদ্মযোনী স্তম্ভিত হলেন। জ্ঞানময় ব্রহ্মা হলেন জ্ঞানরহিত। দর্শন করবার শক্তি পর্যন্ত তাঁর বিলুপ্ত হলো।

তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করলেন—মায়া যবনিকা দিলেন সরিয়ে। ব্রহ্মা বাহ্য দৃষ্টি ফিরে পেলেন।

ঘুমন্ত ব্যক্তি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে যেমন ধীরে ধীরে চার দিকে তাকাতে থাকে তিনিও তেমনি উঠে বসে ধীরে ধীরে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। অতি কষ্টে চোখ খুলে নিজের ও জগতের উপস্থিতি অনুভব করলেন। তখন বৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নয়নগোচর হলো।

মায়ামুক্ত ব্রহ্মা তাঁর ভুল ভুঝতে পেরে চারটি মস্তক শ্রীকৃষ্ণ চরণে লুটিয়ে দিলেন।

আচার্য থামলেন। উদ্ধারণ ঠাকুর বললেন—ব্রহ্মাই যখন মায়ায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারেননি, তখন মায়ায় বদ্ধ দুর্বল জীব কি করে তাঁকে চিনবে? তিনি আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়ালেও আমরা তাঁকে চিনতে পারি না। বিশ্বাস করতে পারি না যে তিনি আমাদেরই মত হাত পা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিচরণ করছেন।

এমন সময় একজন বলে উঠলেন—অনেকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সনাতন বললেন—এবারে সুলতান স্বয়ং আসছেন।

আচার্য্য বললেন—তবে আমরা বিদায় হই ?

—আসুন তবে। এ জীবনে বোধ হয় এই শেষ সাক্ষাৎ।

—জীবন আর কতটুকু ?

সকলে প্রস্থান করলেন।

একটু পরে সুলতান এসে দর্শন দিলেন। সনাতন উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে তাঁকে বসালেন।

সুলতান একটু রুক্ষ স্বরে বললেন—ব্যাপার কি মল্লিক ? তুমি আর দরবারে যাও না, ডেকে পাঠালেও আস না, তুমি কি অসুস্থ ?

সনাতন বললেন—না সুলতান, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

—তবে কাজ কর্ম দেখ না কেন ?

—কাজে আর মন নেই।

—কেন ?

—এতদিন আপনার কাজ করেছি, আর কোন দিকে চাইনি। এখন আমার নিজের কাজ করব, আর কোন দিকে তাকাব না।

—তোমার নিজের কাজ, সে কি রকম ?

—পরকালের কাজ।

—তোমার দুই ভাইয়ের দেখা নেই, দীর্ঘ দিন হলো। তুমিও আর কাজ কর্ম দেখ না. দরবেশ হবে শুনছি। তা হলে রাজ্য চলবে কেমন করে বল ?

—আমাদের মত কত দাস আপনার সেবার জন্য লালায়িত হবে সুলতান। এক কুকুর যাবে; অন্য একজন আসবে। সুলতানের পদলেহন করবার লোকের অভাব হবে না।

—ছি মল্লিক, এ কথা বলো না। তোমার সঙ্গে এতকাল আমি বন্ধুর মতোই ব্যবহার করে এসেছি। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অতুল

পদ-গৌরব, বিপুল ধন-সম্পত্তি সবই তোমায় দিয়েছি। আর কি চাই সাকর মল্লিক? বল কি চাই? তোমাকে অদেয় ত আমার কিছুই নেই।

সনাতন একটু থেমে বললেন—এ অধমের প্রতি সুলতানে যদি এতই কৃপা হয়ে থাকে, তবে আমাকে মুক্তি দিন—এ সম্মান, এ পদ গৌরব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। সম্মান, গৌরব, অর্থ এ সব আমি কিছুই চাই না, আমি ফকির হতে চাই। দয়া করে আমার সব কেড়ে নিয়ে আমায় কাঙাল করে দিন।

—কাঙাল করার মধ্যে কষ্ট ত কিছু নেই।

—শুধু কাঙাল নয়, ফকীর।

—তুমি দরবেশ হতে চাও?

—যে সব জিনিষ থেকে গর্ব অভিমান আসে সে সব থেকে আমি মুক্ত হতে চাই।

—তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। আমি উড়িষ্যা অভিযানে চলেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

—আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান।

—কি, যাবে না? আমার আদেশ পালন করবে না? তুমি মৃত্যুর ভয় করো না?

একটু থেমে সনাতন বললেন—না, আমাকে মারবার শক্তি কারও নেই সুলতান। প্রভু বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হবে। সেই সাক্ষাতের আগে তোমার সাধ্য নেই সুলতান, তুমি আমাকে মারতে পার।

—তোমার প্রভু বুঝি সেই ফকির?

—আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

সুলতান কিছুক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করলেন। তারপর একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য বললেন—তোমাকে ফিরে পাবার কি আর কোন উপায় নেই সাকর মল্লিক?

—সারা পৃথিবীর রাজ্যও যে এখন আমার কাছে অতি তুচ্ছ সুলতান

—আমি তোমার জন্যে কি না করেছি উজীর সাহেব! আমার স্বজাতিদের দূরে ঠেলে তোমায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছি। বেগমের কথা অগ্রাহ্য করে তোমার কথা আমি শুনেছি। তুমি যাকে যে পদ দিতে বলেছ, তাকে সেই পদ দিয়েছি। যাকে রেখেছ, সেই থেকেছে—যাকে মেরেছ সে মরেছে, আমি তোমার জন্যে কি না করেছি!

—আমিও তোমার জন্যে কি না করেছি সুলতান? আমি হিন্দু হয়ে হিন্দুর মন্দির ভেঙেছি, দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ করেছি, গো হত্যা ব্রহ্ম-হত্যা করেছি, ব্রাহ্মণের ইজ্জত মেরেছি, হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করেছি। আমার ইহকাল পরকাল সব তোমার জন্যে নষ্ট করেছি।

বলতে বলতে সনাতনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

সুলতান বললেন—তুমি আমার জন্যে করনি, করেছ রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে।

সনাতন বাধা দিয়ে তেজের সঙ্গে বললেন—তোমার জন্যে করিনি অকৃতজ্ঞ সুলতান? আমি যা করেছি, তা তোমার কোন হিন্দু কখনো করেছে?

—না, কারণ তাদের সে সুযোগ দিইনি। তুমিই যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছো।

—কে চায় তোমার সুযোগ? বাংলায় এমন একটি হিন্দু পাবে না, যে আমার মত আত্মবিক্রয় করে তোমার সেবা করবে। শুধু বাংলায় কেন, সারা ভারতে এমন একটা নির্বোধ পাবে না, যে সব ঘুচিয়ে সব দিয়ে মনিবের সেবা করে। বলতে বাধল না সুলতান, আমি তোমার জন্যে মহাপাপ করিনি, নিজের ঘরে নিজে আগুন জ্বালাইনি।

—দেখছি তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ। আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় যেতে সম্মত আছ কিনা।

—কিছুতেই না।

—তোমার এ অবাধ্যতার দণ্ড কি জান ?

—মৃত্যু ? দণ্ড দাও সুলতান—স্বদেশদ্রোহী, ও ধর্মদ্রোহীকে মৃত্যু দাও সুলতান। আর পারি না—অনুতাপের ভারে জীবন আমার অবসন্ন হয়ে পড়েছে—আমায় শাস্তি দাও, মৃত্যু দাও, কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—কিন্তু মৃত্যু দেবার শক্তি তোমাদের নেই। অধিকার নেই। তোমার হাজার হাজার জল্লাদ এমন কি, যমরাজ স্বয়ং এসেও আমায় এখন মারতে পারবেন না।

—দেবার শক্তি আছে কিনা আগে উড়িষ্যা থেকে ফিরি। আপাতত তুমি বন্দী হলে।

কারাধ্যক্ষ হবু শেখ আহ্বান পেয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। সুলতান বললেন—এই নিমকহারামকে কড়া পাহারায় রেখো।

গৌড় রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সনাতন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

॥ ষোলো ॥

এদিকে রূপ আর অনুপ এলেন প্রেমভাগে।

এসে দেখলেন তাঁদের জমিদারীতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা। বাবা-মা আগেগই দেহ রেখেছেন—আত্মীয় স্বজনও কেউ নেই। তাদের খুড়তুতো ভাইরা তখন নৈহাটিতে বাস করছিলেন।

রূপ এর আগে খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে বিষ্ণুকে নৈহাটি থেকে আনিয়ে প্রেমভাগে রেখেছিলেন খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে বিষ্ণুর বুদ্ধিই ছিল সবচেয়ে বেশি।

রূপের অনুমতি নিয়ে বিষ্ণুই জমিদারী মোটামুটি দেখাশোনা করছিলেন। রূপ ভাবলেন, বিষ্ণুকেই শ্রীজীবের অভিভাবক করবেন।

কিন্তু বিষ্ণু বড় অত্যাচারী আর চরিত্রহীন।

তাঁর অত্যাচারে সারা চাকলা কাঁপত। কারও কিছু বলবার যো নেই। সুলতানের কাছে কেউ নালিশ জানালে তিনি সুলতানের দ্বারা অপদস্থ হতেন। উজীর সাহেবের আশ্রিত ভাই বিষ্ণুকে দমন করবে কে?

অপ্রতিহত ভাবে অত্যাচার চলতে লাগল।

যেখানে অত্যাচার, সেখানেই বিশৃঙ্খলা। লুণ্ঠিত প্রজারা খাজনা দিতে পারত না। যারা পারত, তারা ইচ্ছা করেই খাজনা দিত না। প্রজারা তখন একজোট হয়ে অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল।

ঠিক এই সময় রূপ এসে পৌঁছুলেন।

রূপ এসে প্রজাদের ডেকে হৃদয় দিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলেন। প্রজাদের সামনে বিষ্ণুকে তিরস্কার করলেন রূপ। বিষ্ণু ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে রূপের পা জড়িয়ে ধরলেন।

তাঁর কান্না দেখে রূপ ভুলে গেলেন।

তিনি বিষ্ণুকে অনেক উপদেশ দিলেন। বিষ্ণু বলল—এবার থেকে সে বেশ চিন্তা করে কাজকর্ম দেখা শোনা করবে।

রূপ কিছু দিন প্রেমভাগে থেকে গেলেন বৃন্দাবনে।

রূপকে বৃন্দাবনে বিদায় দিয়ে বিষ্ণু আবার আগের মূর্তি ধরলেন। যা ইচ্ছা করেন সবাইকে ধমক দেন। তাঁর ভয়ে সকলে তঠস্থ।

এমনি ভাবে বিষ্ণু একবার এক ব্রাহ্মণের জমি জোর করে দখল করলেন।

ব্রাহ্মণ অনেক কান্নাকাটি করলেন বিষ্ণুর কাছে। কিন্তু বিষ্ণু বললেন—তুমি খাজনা বন্ধ করেছিলে কেন? আর জমি পাবে না।

ব্রাহ্মণ অগত্যা পায়ে হেঁটে গেলেন বৃন্দাবনে। রূপকে খুঁজে বের করে তিনি সব কথা তাঁকে বললেন।

রূপ সব শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি একটি প্রস্তর ফলকের ওপর একটি শ্লোক খোদাই করে তা ব্রাহ্মণকে দিলেন। বললেন—দেশে ফিরে গিয়ে এটি বিষ্ণুকে দিয়ো।

শ্লোকটির অর্থ ছিল এই: যদুপতি কেন মথুরা পুরীতে গিয়েছিলেন? রঘুপতি কেন গিয়েছিলেন উত্তর কোশলে, এই সব কথা চিন্তা করে মন স্থির কর।

বিষ্ণু শ্লোকটি ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেয়ে ব্রাহ্মণকে তাঁর জমি জমা সব ফিরিয়ে দিলেন।

তিনি নিজেও কিছুদিন পরে প্রেমভাগ ছেড়ে বর্তমান খুলনার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে চলে যান।

* * * *

কিন্তু যে সব পরের কথা।

রূপ গৌড় থেকে প্রেমভাগে ফিরেই দেখলেন প্রজাদের দুর্দশা। তিনি খুব দুঃখিত হলেন। লুণ্ঠিত প্রজাদের তিনি প্রচুর অর্থ দান করিলেন। কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন। পুষ্করিণী খননের জন্যে গ্রামে গ্রামে প্রজাদের হাতে প্রচুর অর্থ দিলেন। দুস্থ ব্রাহ্মণদের জীবিকা উপার্জনের উপায় করে দিলেন। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের সাহায্যের জন্যে বহু স্বর্ণ মুদ্রা দান করলেন।

এইভাবে সঞ্চিত অর্থের বেশির ভাগ দান করে রূপ ও অনুপ বৃন্দাবনে যাবার জন্যে তৈরী হলেন।

বিষ্ণু সব দেখে বললেন—এসব কি ভাল হলো?

রূপ বললেন—কেন?

—মানে প্রজাদের লোভ বেড়ে গেল।

—তা নয়, তারা বাঁচাবার পথ খুঁজে পেলো। তারা না বাঁচলে তোমায় খাজনা দেবে কে?

—আচ্ছা সন্তোষ—

—সন্তোষ নয়, এখন রূপ।

—আচ্ছা রূপ, তোমার হঠাৎ এমন বৈরাগ্য এলো কেন বলো ত?

রূপ বললেন—বৈরাগ্য সহসা হয়নি—তবে দাসত্বে ঘৃণাটা হঠাৎ এসেছিল।

—কি রকম?

—সে বড় মজার ঘটনা। একদিন রাত্রিতে খুব জল ঝড় এমন সময় সুলতান আমায় ডেকে পাঠালেন। কি করি, ঘোড়ায় উঠলুম। ঘোড়া সেই দুর্যোগে যেতে চায় না, মেরে ধরে নিয়ে চললুম। ঝড়ের বেগে সহসা একটা গাছ ভেঙে পড়ল। ঘোড়া চমকে উঠে ফেলে পালাল। আমি চললুম হেঁটে।

—তারপর ?

—পথে অনেক জল জমেছিল—যাওয়ায় শপ্ শপ্ শব্দ হচ্ছিল। এক গরীব লোকের কুটিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সেই গৃহস্থ বধূ তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ দুর্যোগে, অন্ধকারে কে বের হয়েছে গো? চোর টোর নয় ত? স্বামী উত্তর করলেন—চোর দুর্যোগে বেরুবে না, তবে কুকুর হতে পারে। গৃহস্থ বধূ এ কথা শুনে একটু থেমে বললেন—না গো, কুকুরও নয়, বোধ হয় কেন বড় লোকের চাকর।

—উঃ, সত্যি দাদা গোলামী করার চেয়ে খারাপ কাজ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

সেইদিন থেকেই আমার দাসত্বে ধিক্কার জন্মে গেছে। তার ওপর বহুদিন থেকেই আমার প্রাণ কাঁদছে এই সংসারের নরক বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে।

এমন সময় অনুপ এসে দাদার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর দুটি চোখই অশ্রুময়। রূপ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ভাই ?

—দাদা, আমি পারলাম না।

—কি পারলে না ভাই ?

—রঘুনাথকে ছেড়ে কৃষ্ণের উপাসনা করতে পারলাম না দাদা। আমি যতই কৃষ্ণকে ডাকতে যাই, ততই যেন রঘু এসে আমায় জড়িয়ে ধরেন। আমি মুখে কৃষ্ণকে ডাকি, কিন্তু হৃদয় জুড়ে এসে দাঁড়ান রঘুনাথ। দাদা আমি কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে পারব না —আমি ছাড়লে তিনি আমায় ছাড়েন না।

'রঘুনাথের পাদ পদ্ম ছাড়ন না যায়,
ছাড়িবার মন হইলে প্রাণ ফাটি যায়।'

রূপ বললেন—ভাই যিনি রঘুনাথ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। যদি তোমার ইচ্ছা হয় রঘুনাথেরই উপাসনা কর ভাই, কোনও দুঃখ নেই।

অনুপ তখন চোখ মুছে সুস্থ হলেন।

এমন সময় বিষ্ণু বললেন—দূরে একটা লোক দেখছি, আমাদের লক্ষ্য করে ছুটে আসছে যেন।

—এ লোকটিকে আমি যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে। আরে এ ত আমাদের দাদার প্রিয় চাকর অধর।

ইতিমধ্যে অধর এসে রূপকে প্রণাম করল।

রূপ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি সংবাদ অধর ?

—বড় রাজা কয়েদ খানায় আবদ্ধ।

বলেই সে হাঁপাতে লাগল।

—সে কি, কোন অপরাধে? রূপ সপ্রশ্ন হাসিতে অধরের দিকে চাইল।

—সুলতান উড়িষ্যায় নিয়ে যেতে চাইলেন, প্রভু সম্মত হননি। উল্টে তিনি সুলতানের সঙ্গে তর্ক করেছেন।

—এতটা হবে তা ত ভাবিনি। ভেবেছিলাম তাঁরই প্রাসাদে হয়ত নজরবন্দী থাকবেন। যাই হোক, এখন তাঁকে মুক্ত করতে হবে। সে ভার আমি তোমারই উপর দিচ্ছি অধর।

—আজ্ঞা করুন।

—দশ হাজার রূপেয়া নাও। তুমি সোজা গৌড়ে গিয়ে এই টাকা দিয়ে কারাধ্যক্ষ হবু শেখকে বশ করবে। তিনি এই টাকার বিনিময়ে নিশ্চয়ই দাদাকে মুক্তি দেবেন। আর আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেটা দাদাকে গোপনে দিও। পারবে ত ?

—এ ত অতি সামান্য ভার দিলেন—কয়েদখানা ভেঙে বড় রাজাকে আনতে বললে তাও পারতুম।

—আমি জানি তুমি চতুর ও প্রভুভক্ত। তুমি নিশ্চয়ই এ কার্য উদ্ধার করতে পারবে। কিন্তু সাবধান, সুলতান উড়িষ্যায়

চলে যাবার আগে কিন্তু ভুলেও কারাগারের কাছে যেয়ো না। পরে যাবে বুঝলে ?

—কিছু সৈন্য আগে গেছে, কিছু প্রস্তুত হচ্ছে। বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই যাবেন।

—বেশ, আমি তোমাকে অর্থ ও চিঠি দিইগে চল। রাত্রি-প্রভাত হলেই আমরা বৃন্দাবনের দিকে রওনা হব।

—যাত্রা আজ হলেই ভাল হতো।

—কেন ?

—সুলতান হুকুম দিয়েছেন আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে। এতদিনে হয়ত লোক ছুটেছে, কবে এসে পড়ে তার ঠিক কি ?

বিষ্ণু এতক্ষণ চুপ করেছিলেন।

এবারে সৈন্যদের আসার সংবাদ শুনে বললেন—ওরে বাপ্ রে, আমাদের রাজ্যে এসে দাদাকে ধরে নিয়ে যাবে. এত ক্ষমতা। বিষ্ণু শর্মা থাকতে সে কাজ হচ্ছে না। আমরা ত এক সময় কর্ণাটে রাজত্ব করেছিলাম। কই আসুক দেখি কতো ক্ষমতা তাদের বোঝা যাবে এখন। আমি থাকতে তা হচ্ছে না বাবা।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই দূরে ঘোড়ায় ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল।

বিষ্ণু তখন রূপ আর অনুপকে টেনে নিয়ে গিয়ে মহলের একটা ঘরে বন্ধ করলেন। অন্দর মহলের দরজায় পাহারা বসল। বিষ্ণু তখন বাইরে এসে রাজসৈন্যের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পড়ল। লোক অল্পই এসেছিল —সুলতানের আদেশই তারা মনে করেছিল যথেষ্ট।

বিষ্ণু মনে মনে বললেন—আরে মোট এগার জন লোক! এদের সঙ্গে আর লড়াই করব কি—গলা টিপে ধরলেই ত হলো! কিন্তু না, একটা মজা করতেই হবে এদের সঙ্গে !

মনে মনে ভাবলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না।

ওদের দলপতিকে বলল—আসুন খাঁ সাহেব, আমাদের প্রচুর সৌভাগ্য যে, আপনার পায়ের ধূলো এই গরীব খানায় পড়েছে।

দলপতি খাঁ সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে অতি গম্ভীর ভাবে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি মন্ত্রী দবীর খাসের বাড়ি ?

বিষ্ণু বললেন—এই বাড়ি তাঁর ছিল বটে, এখন আমার তিনি বাড়িঘর সব আমায় বিক্রী করে নদীর ওপারে ঐ যে খড়ের ঘর দেখছেন ঐখাতে চলে গেছেন।

—খড়ের ঘরে ?

—হ্যাঁ খাঁ সাহেব।

—কেন ?

—আরে এঁর রে মাথা খারাপ হয়েছে। দিনরাত শুধু নমাজ পড়েন আর চীৎকার করে গান করেন, অনুপও সঙ্গে আছে।

—ছি ছি, এত বড় আমীরে—

—এখন এক্কেবারে ফকীর।

—তাজ্জব কি বাত।

ঠিক বলেছেন। আপনি বুদ্ধিমান লোক- হয়ত শিগ্‌গীর আপনিই আমীর হয়ে যাবেন।

—বড় খুসী হলাম আপনার কথা শুনে।

—আমার গরীব বাসায় একটু বিশ্রাম করুন।

—কিন্তু আগে আমি একবার ওপারে ঘুরে আসব।

—কেন খাঁ সাহেব ?

—দবীর খাঁকে বড় প্রয়োজন।

—কিন্তু ওপারে গেলে বিশ্রাম করবেন কোথায় ? তার চেয়ে আপাততঃ বিশ্রাম করুন—সন্ধ্যার পর বরং ওপারে যাবেন। কেমন ? খানা টানা পাকাতে হবে ত।

তা ত হবেই।

—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনার মত আমীর লোক—

খাঁ সাহেব তাঁর লোকজন নিয়ে বসলেন বিশ্রাম করতে। বিষ্ণু তাদের খাদ্য আর পানীয় সরবরাহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভৃত্যদের ডেকে হুকুমের পর হুকুম করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা সুখাদ্য এসে গেল। খাঁ সাহেব বড়ই আনন্দিত হলেন।

একটু পরে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলো। নদীর বুকেও ছায়া পড়ল।

বিষ্ণু খাঁ সাহেবকে চুপি চুপি ডেকে বললেন—ওই যে নদীর ওপারে দুজন লোক ঘরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা আপনার সেই ঘাস আর তার ভাই ঘোড়ার ঘাস। দুটোই সমান ভণ্ড, এখান থেকে গেলে বাঁচা যায়।

খাঁ সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন—ওপার থেকে আমি একটু ঘুরে আসি। কি জানি যদি রাতারাতি সরে পড়ে।

—না পালাবে কোথায়?

—বলা ত যায় না। আপনি দুটো নৌকা দিতে পারেন?

—নৌকা কি বলছেন? আপনার মত আমীর লোককে দরকার হলে গোটা বাড়ি ছেড়ে দিতে পারি।

তখন বিষ্ণু আদেশ দিলেন—দুটো খুব ভাল নৌকা ঘাটে এসে লাগল। চকচকে নৌকা দেখে খাঁ সাহেব খুব খুশি হলেন। তিনি দলবল নিয়ে নৌকা দুটোতে উঠে বসলেন। ঘোড়াগুলি ওপারেই রইল।

নৌকা চলতে চলতে যেমন নদীর মাঝখানে গেছে, অমনি বিনা ঝড় জলে নৌকা হঠাৎ ডুবতে লাগল।

নৌকা কাত হলো না, একেবারে সোজা—ডুবতে লাগল।

—এ কি হলো?

খাঁ সাহেব চীৎকার করে উঠলেন। সঙ্গীরা সকলে পোষাক,

পাগড়ি, জুতা পটি, নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সকলে একসঙ্গে চীৎকার জুড়ে দিল।

নৌকাগুলো আপাতদৃষ্টিতে ভাল হলেও আসলে সেগুলি ছিল কুটো। তা কেউ জানত না, এক বিষ্ণু ছাড়া।

বিষ্ণু মহানন্দে হাততালি দিতে লাগলেন।

সকলে জলের মধ্যে লাফ দিল।

কিন্তু কেউ ভাল সাঁতার জানে না। গঙ্গার প্রবল স্রোতে তারা তলিয়ে যেতে লাগল।

তিনজন কেবল অনেক কষ্টে সাঁতারে তীরের দিকে এগোতে লাগল।

কিছুটা সাঁতার কাটে আর হাবুডুবু খায়—এমনি করে তিনজনে তীরের কাছে এসে ডুবল।

শুধু দলপতি খাঁ সাহেব একা তীরের কাছে এসে উঠলেন। অনেক কষ্টে তীরে উঠে হাঁপাতে লাগলেন।

বিষ্ণু বললেন—আসুন খাঁ সাহেব—

খাঁ সাহেব বললেন—শয়তান, বেইমান—তোমাকে আমি ফাঁসিতে লটকাবার ব্যবস্থা করব।

বিষ্ণু বললেন—তার দরকার হবে না। তোমার ব্যবস্থা তৈরী।

বিষ্ণু ইংগিত করতেই একজন লোক একটা বর্শা তাঁর বুকে বিঁধিয়ে দিল।

খাঁ সাহেব পড়ে গেলেন।

বিষ্ণুর আদেশে ভৃত্যেরা তীরে যে দেহগুলি ডুবেছিল সে গুলিও তুলে আনল।

তারপর সব দেহ গুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

আগুন দেখে রূপ বাইরে এসে বললেন—একি করেছ বিষ্ণু?

বিষ্ণু বললেন—ধুনো দিচ্ছি।

—ছি, এতগুলো লোক মারলে?

—আমি কি মেরেছি ? খোদা মালিক—তিনিই সব করছেন।

—তুমিই নৌকাতে ফুটো রেখেছিলে।

—আমি কে ভাই। তিনিই হৃদয়ে বসে বুদ্ধি জোগালেন—ভাই তাঁর হুকুমে কাজ করলাম। গীতা পড়েছ ত ?

—হ্যাঁ।

—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন—পড়োনি ? না পড়লে কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

—পড়েছি। কিন্তু এই কাজের পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ ?

—জানি। সব দেড়ে বাবাজী জাহান্নামে গেলে আমি বেহেস্তে যাব।

—পরিহাস রাখ, সুলতান শুনলে—

—রাখ সুলতান। তিনি আগে উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের কবল থেকে বেঁচে ফিরুন। যদিও ভাগ্যের জোরে ফেরেন, এমন পিটুনী খাবেন যে সব ভুলে যাবেন। এসব কথা মনেও থাকবে না।

বিষ্ণু হাসতে থাকেন।

॥ সতরো ॥

গৌড়ের শ্রেষ্ঠ ভূষণ কারাগারে।

গৌড় স্তব্ধ—জগৎ স্তম্ভিত। এ ত্যাগ, এ বৈরাগ্য তারা বোধ হয় কখনও দেখেনি। হয়ত সংসারেও কেউ দেখেনি।

একবার দেখেছিল বহুপূর্বে। সেই কোন্ সুদূর যুগে, যখন নবীন রাজকুমার স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করে হয়েছিলেন সন্ন্যাসী।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। ইতিহাস তখন প্রস্তরফলকে জন্ম নিয়ে সবে এগিয়ে যেতে সুরু করেছে।

আর আজকে সনাতনকে দেখে জগৎ নতুন শিক্ষালাভ করল—সবাই বুঝল, সেই প্রাচীন রাজপুত্রের কাহিনী সত্য।

নির্জন কারাগার।

সনাতন বেশ আছেন। কোনও চিন্তা নেই তাঁর হৃদয়ে—শুধু এক স্বর্ণকান্তি মহাপুরুষ তাঁর সারাটা হৃদয়, সারাটা সত্বা জুড়ে অবস্থান করছেন। সনাতন সেই মূর্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তন্ময়। কখনও পূজা করেন, কখনও কথা বলেন, কখনও ধ্যান করেন।

মনে মনে বলেন—প্রভু, তুমি দিনরাত যার অন্তরে, তার কিসের উদ্বেগ, কিসের ভয়?

সনাতনেয় মনে তাই আজ শুধু পূর্ণ আনন্দ। সনাতনের পূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর ইচ্ছায় আজ তিনি কারাগারে; আবার প্রভুর ইচ্ছা হলেই মুক্তি পাবেন।

সেদিন রাত্রি!

সনাতন তখন আপন মনেই চিন্তা করছেন— প্রভু এখন কোথায়? বৃন্দাবনেই কি তিনি আছেন? না, বৃন্দাবন থেকে বোধ হয় নীলাচলে ফিরেছেন। ফেরার সময় কি হয়েছে? আমি কতদিন এখানে আছি?

পাশেই কিছুদূরে ভৃত্য ঈশান শুয়েছিল। সে উত্তর দিল—আজ তিন মাস হবে।

—কে, ঈশান?

—হ্যাঁ, আপনার দাস।

সনাতন কি যেন ভাবলেন। বললেন—ঈশান তুমি এখন এখানে কেন? তুমিও কি বন্দী?

—আমি বন্দী নই প্রভু। তবে প্রভু যেখানে থাকে, ভৃত্যও ত সেখানেই থাকে—তা না হলে প্রভুর সেবা করবে কেমন করে?

—কিন্তু তুমি কেন আমার সেবা করবে ঈশান? আমি এখন ভিখিরীরও অধম।

ঈশান হাসল। বলল—প্রভু চিরদিনই প্রভু।

—তুমি আমাকে প্রকৃত শিক্ষা দিলে ঈশান। মঙ্গলময় সব অবস্থাতেই মঙ্গলময়। জীবের মঙ্গল করবার জন্যে তিনি সব সময়ই তৎপর।

—আপনাকে শিক্ষা দেব আমি?

—কে কখন কাকে শিক্ষা দেয়, কেউ বলতে পারে না। সারথি মাতলী একদিন ভগবান বুদ্ধকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। দেখিয়েছিলেন রোগ, শোক, জরা আর মৃত্যুর স্বরূপ। তাই দেখেই রাজকুমার গৌতম বেরিয়েছিলেন অমরত্বের সন্ধানে—আর সেই পরম বোধি লাভ করেই হয়েছিলেন ভগবান বুদ্ধ।

—সে কথা যাক, আমরা এখানে তিন মাস বসে আছি, প্রভু হয়ত

এতদিনে আবার নীলাচলে ফিরে গেলেন। তাঁকে কি আপনার দেখতে ইচ্ছে হয় না?

—আমার প্রভুকে? আমার হৃদয়ের পরম অধীশ্বরকে দেখতে ইচ্ছে হয় কিনা জিজ্ঞাসা করছ? কি করে তোমাকে বোঝাব ঈশান, আমার হৃদয় কত ব্যাকুল হয়েছে! আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু যে তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটোছুটি করছে।

—তবে আগে এই কারাগার থেকে মুক্তির উপায় বের করুন।

—আমি কি উপায় করব? আমার বুদ্ধি আর শক্তি কতটুকু? উপযুক্ত সময়ে প্রভুই বুদ্ধি আর শক্তি জোগাবেন।

—সেজ রাজা বৃন্দাবনে চলে গেছেন শুনেছি। তিনি নাকি আপনার জন্যে দশ হাজার মুদ্রা অধরের কাছে রেখে গেছেন।

—জানি। কিন্তু আমার সময় হয়েছে কি? প্রভু, বলে দাও আর কতদিন পরে তুমি আমায় কৃপা করবে। বলো, আমার পাপের ক্ষয় হতে আর দেরী কত?

ঈশান কোনও কথা বলতে পারল না। শুধু অবাক বিস্ময়ে প্রভুর অপার বৈরাগ্য দেখতে লাগল।

এমন সময় কারাধ্যক্ষ হবু শেখ ভেতরে এলো। সনাতনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—জনাবের কোনও হুকুম আছে কি?

সনাতন বললেন—কি আর তোমায় হুকুম করব হবু? আমিই এখন তোমার হুকুমের দাস।

—ও কথা বলবেন, না হুজুর। আমি আপনার খেয়েই মানুষ। আপনি দুবার আমার জান বাঁচিয়েছেন, আমাকে এই নোক্‌রি দিয়েছেন।

—কিন্তু সময়ে সবই পরিবর্তিত হয় হবু।

—তা হয় না। আমি নিমকহারাম নই জনাব। আমি জানি আপনি যদি কাল সুলতানকে মিষ্টি মুখে দুটো কথা বলেন, তিনি তক্ষুনি গলে জল হয়ে যাবেন—মহাখুশি হয়ে তিনি আবার

আপনাকে গদিতে বসাবেন। আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করে এখানে পড়ে আছেন হুজুর!

—সুলতান এখন কোথায়?

—উড়িষ্যায় তিনি আজও লড়াই করছেন। আমাদের ফৌজ খুব হারছে, তবু সুলতান ছাড়ছেন না।

—তিনি যখন এখানে নেই, তখন কাকে ঝুটো মিষ্টি কথা বলব হবু?

—সে কথা অবশ্য ঠিক।

—আচ্ছা হবু, তুমি কয়েদখানা থেকে কাউকে কখনও লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছ কি?

—ঝুটা বলব না হুজুর, দিয়েছি।

—আমাকে ছেড়ে দিতে পার কি?

—হুজুর হুকুম করলেই পারি। হুজুরের দেওয়া নোকরী হুজুরের জন্যে না হয় ছেড়ে দেব।

—ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবে?

—দেশে। এখানে থাকলে জান যাবে।

—কিন্তু দেশে খাবে কি? তোমার ছোট ছোট ছেলেদের খাওয়াবে কি?

—খোদা খাওয়াবেন। আমি কে?

—খোদার ওপর তোমার এতই বিশ্বাস?

—তাঁর দয়ার ওপর আমার বিশ্বাস আছে হুজুর। তাঁর রাজ্যে যদি কেউ পূর্ণভাবে তাঁর ওপর নির্ভর করে সে কখনও উপবাসে মরে না।

—যার এত বিশ্বাস তাকে খোদা কখনও কষ্ট দেবেন না। আমি তোমাকে দশ হাজার রূপেয়া দিচ্ছি, নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও।

—হুজুর এত রূপেয়া আমি সারা জীবন ধরে পরিশ্রম করলেও

উপার্জন করতে পারতুম না। কিন্তু হুজুরের কাছ থেকে এ অর্থ নিতে পারি না আমি।

—খোদা তোমার ছেলেদের জন্যে তোমাকে এই অর্থ দিচ্ছেন—শুধু মাত্র আমার হাত দিয়ে। খোদার দান ফিরিয়ো না।

হবু আর উত্তর দিল না।

সনাতনের ইংগিতে ঈশান চলে গেল। একটু পরে অধরের কাছ থেকে দশ হাজার মুদ্রা এনে দিল।

হবু সেটা নিল বটে, কিন্তু বড় অনিচ্ছা সত্বে।

হাত জোড় করে হবু বলল—জনাব আমার বাপ-মা, চিরদিন খাওয়াচ্ছেন, ভবিষ্যতে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। আমি আমার বাপের কাছ থেকে অর্থ নিলাম—খোদা আমায় মাপ করো। এখন জনাবের হুকুম কি?

সনাতন বললেন—আমায় গঙ্গাপারে রেখে এসো।

হবু তক্ষুণি সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে কারাগার থেকে বের হলো। সঙ্গে সঙ্গে চলল ঈশান। সকলে মিলে এলেন গঙ্গাতীরে।

সে সব আজ কত দিন আগেকার কথা—কিন্তু যে কারাগারে সনাতন বন্দী ছিলেন তার ধ্বংসাবশেষ ফতেপুরে আজও দেখা যায়। ধ্বংস স্তূপের ওপর এক অতি প্রাচীন বট বৃক্ষ দণ্ডায়মান। সেই বৃক্ষ জগৎকে যেন বলছে—সেই মহান বৈরাগ্য আমি দেখেছি।

ওদিকে ঠিক তেমনি সময়ে প্রয়াগতীর্থে ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন শ্রীমন মহাপ্রভু। তিনি তখন রূপকে বললেন—এইমাত্র সনাতন কারামুক্ত হলো। সে আসছে।

॥ আঠারো ॥

সনাতন গঙ্গার ধার দিয়ে চলতে লাগলেন।

তখনও রাত্রি প্রভাত হয়নি। ঈশান পেছনে পেছনে আসছিল। জিজ্ঞাসা করল—এখন কোথায় যাবেন?

সনাতন বললেন—কোথায় আবার যাব? যাবার জায়গা দুটো আছে নাকি?

—প্রভু কি এই দিকে আছেন?

—তা জানি না। আমার মন আর চরণ যে দিকে আমাকে নিয়ে যাবে, বুঝব প্রভু সেই দিকেই আছেন।

—আর যদি ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়?

—তা হতে পারে না ঈশান।

দুজনে অন্ধকারে চলতে লাগলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলো। সনাতনের গায়ে ছিল শুধু মাত্র একটি শীতবস্ত্র। সনাতন পথের মাঝে দেখলেন একটি বৃদ্ধ মুসলমান প্রচণ্ড শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। সনাতন শীতবস্ত্রটি তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন—আপনি দয়া করে এটি গ্রহণ করুন।

বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে সনাতনের দিকে চেয়ে রইল। এমন অপূর্ব দান সে জীবনে দেখেনি। নিজের শেষ সম্বলটি পর্যন্ত ত্যাগ করতে কে কবে দেখেছে?

সনাতন আর তার দিকে না চেয়ে দ্রুত পথ চলতে লাগলেন।

ক্রমে দুপুর হলো।

গ্রাম প্রান্তে একটি গাছের ছায়ায় দুজনে বিশ্রামের জন্যে বসলেন।

ঈশান গ্রামে গিয়ে সামান্য কিছু ভিক্ষা করে আনল—তাতেই দুজনের খাওয়া হলো।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার দুজনে পথ চলতে লাগলেন।

পার্বত্য পথ, বড়ই বিপদসংকুল। কখনও উঠছে, কখনও নামছে।

তখন পশ্চিম দিক থেকে বাংলায় প্রবেশের মাত্র তিনটি পথ ছিল। প্রতেক পথই বিপদ সংকুল। পথের পাশে দুরতিক্রম্য পর্বত। সনাতন সবচেয়ে বেশি বিপদ সংকুল পথ ধরেই এগোলেন।

ঈশান বলল—এ পথে কেন এলেন প্রভু? এ পথে যে দস্যু-ভয় আছে।

সনাতন বললেন—এ পথটাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত—অন্য পথে অনেক বেশি হাঁটতে হবে। তা ছাড়া আমাদের কাছে কি আছে ঈশান যে আমরা দস্যুভয় করব?

ঈশান বলল—প্রাণটা ত আছে।

আসলে ঈশান পনেরোখানি স্বর্ণ মুদ্রা লুকিয়ে সঙ্গে এনেছিল। তার ভয়, যদি চোর ডাকাতে সেগুলো কেড়ে নেয়।

সনাতনও তাকে একটু সন্দেহ করলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললেন—প্রাণ কেউ নিতে পারে না ঈশান, কর্তা এক জন—তিনিই কেবল নিতে পারেন।

ঈশান কোনও উত্তর দিল না। নীরবে সনাতনের পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

অনেক দূর চলবার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসে চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলল।

দুজনে আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন।

এমন সময় একজন লোক পর্বতের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলো

বলল—আপনি দয়া করে আমার কুঠিরে থাকুন। রাতের মত বিশ্রাম করে সকালে চলে যাবেন যে দিকে ইচ্ছা।

লোকটা দেখতে বীভৎস বা কুৎসিৎ নয়—তবু তাকে দেখলে মনে হয় লোকটির মনে নিশ্চয়ই কোনও কুমতলব আছে।

লোকটি সত্যই দস্যু—দস্যুতাই তার পেশা। পুরুষানুক্রমে সে এই পাহাড়ে দস্যুতা করে আসছে।

তার আতিথ্য গ্রহণ করতে ঈশান ইতস্তত করছিল। কিন্তু সনাতন নির্ভয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঈশানের মনে তখন বড়ই উৎকণ্ঠা।

দস্যু ভেতরে গেলে ঈশান বলল—এই লোকটিকে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। বোধ হয় এ দস্যু।

—তা হতে পারে।

—তা হলে উপায়?

—এ ভয়. এ উৎকণ্ঠা নিয়ে কেন চলছ ঈশান? সঙ্গে যদি কিছু থাকে ত লোকটাকে দিয়ে দাও।

—কিছু আছে বটে, কিন্তু সম্বলহীন হয়ে পথ চলা কি ভাল?

—অর্থ সম্বল নয়, অর্থ বিপদ। আর যদি প্রকৃত সম্বল চাও তাঁর ওপর নির্ভর কর।

—আমি চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকলে কি আমার আহার জুটবে?

—নিশ্চয় জুটবে।

—কি করে?

—তাঁর ওপর ঠিক নির্ভর করতে পার যদি, তিনি তোমার আহার্য মাথায় করে বয়ে এনে দেবেন।

—তবে কি পুরুষকার বলে কোনও জিনিষ নেই?

—আছে ঈশান, তোমার এই যে অসীম বিশ্বাস, এই যে পূর্ণ নির্ভরতা, এটাই মস্ত বড় পুরুষকার।

ঈশান আর কিছু বলল না। সে চীৎকার করে দস্যুকে ডাকল —এদিকে এসো ভাই।

দস্যু ভেতরে এলো।

ঈশান মোহর কয়টি গুণে গুণে তার হাতে তুলে দিল।

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দস্যু বলল—দিলে ভালই করলে—না হলে এর জন্য তোমাকে খুন হতে হতো। যাই হোক, যখন স্বেচ্ছায় দিয়েছ, তখন আমি সব নেব না, তুমি একটি নাও।

ঈশান বলল—না আমি নেব না।

—কেন?

—আজ আমি আমার প্রভুর কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি, তা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, অর্থই সর্বনাশের মূল। আর আমি জীবনে অর্থ স্পর্শ করব না।

—অর্থ সর্বনাশের মুল, একথা বলে কে?

=আমার এই প্রভু আমার গুরুদেব। এঁর প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল,সব বিলিয়ে দিয়ে এখন দরবেশ হয়েছেন।

—এত বড় নতুন কথা! অর্থ সর্বনাশের মূল বাঃ! কিন্তু অর্থ না হলে যে দিন চলে না। সনাতন মুখ তুলে তার দিকে চাইলেন।

তাঁর নয়নে করুণা ও প্রেম। দস্যুর দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল।

সনাতন প্রভুকে স্মরণ করে মনে মনে বললেন—প্রভু, এ আমারই মত মহাপাপী—আমাকে বিষয়-কামনা থেকে মুক্ত করেছ, একেও উদ্ধার কর দয়াময়।

তারপর প্রকাশ্যে দস্যুকে বললেন—অর্থ না হলে কেন দিন চলবে না ভাই? আমার ত কিছুই নেই, তবু দিন ত বেশ চলে

যাচ্ছে। আর এখন যে ভাবে সুখে চলছে, আগে ত সে ভাবে চলেনি।

—ক্ষিদে পেলে কি কর?

—তাঁকে ডাকি। যিনি তোমাকে, আমাকে, রাজাকে বাদশাহকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে ডাকি। তিনি আহার যোগান।

—কাকে ডাক? সে কে?

—যিনি তোমাকে, আমাকে, আকাশ-পৃথিবী সূর্য চন্দ্র সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাম ভগবান।

—ভগবান? কই এ নাম ত কখনও শুনিনি। তিনি দেখতে কেমন? থাকেন কোথায়?

—তিনি বড় সুন্দর। এত সুন্দর জগতে আর কিছুই নেই। তিনি থাকেন সব স্থানে—সর্বত্র।

—আমার আশে পাশে আছেন?

—নিশ্চয়ই আছেন, ডাকলেই তিনি দেখা দেন।

—আমি তাঁকে ডাকব। কি বলে ডাকতে হয়?

—ডাক, ডাক, কৃষ্ণ বলে তাঁকে ডাক। ঐ মেঘের মত তাঁর গায়ের রং, ওই সুনীল আকাশের মত তাঁর চোখের বর্ণ। মাথায় চূড়া, পায়ে নূপুর, হাতে বাঁশী, পায়ের ওপর পা দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরিধানে পীতবস্ত্র, গলায় বনফুলের মালা, অধরে বাঁকা হাসির রেখা, নয়নে অপার করুণা। ডাক ডাক ভাই ওই রূপ হৃদয়ে ধারণ করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাঁকে ডাক। তিনি আসবেন। তোমার বুকের ভেতর আসবেন, তোমার চোখের ওপর আসবেন—তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন।

—না, আমি ডাকব না।

—কেন ডাকবে না?

—আমি এত দিন তাঁকে ডাকিনি, আজ হঠাৎ ডাকলে তিনি যদি এসে আমায় বকেন, শাস্তি দেন?

—তিনি ও কোনও অপরাধই গ্রহণ করেন না ভাই। তিনি শাস্তি দিতে জানেন না, শুধু ভালবাসতেই জানেন। তিনি আদর করেন, কান্না দেখলে চোখের জল মুছিয়ে দেন। তিনি যে দুনিয়াময় এই কাজই করে বেড়াচ্ছেন।

—ঠাকুর, তুমি থাম। আমার কিছুই ভাল লাগছে না—বুকের ভেতরে কেমন করছে। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কি বল্লে তাঁর নাম?

—শ্রীকৃষ্ণ।

—তুমি একবার ডেকে শোনাও ত।

—কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ—

—আমি একবার ডেকে দেখব? ভয় নেই ত?

—সে নামে ভয়? ওরে, সে নামে যে ভয় দূর হয়।

—কিন্তু আমার বাপ পিতেমো যা কখনও করেনি, তা কেন তোমার কথায় করতে যাব?

—নাম করবে না?

—না।

সনাতন আর কোন কথা বললেন না। তিনি নিজেই ধীরে ধীরে কৃষ্ণ নাম করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঈশান দেখল দস্যুও সনাতনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনাম করতে সুরু করেছে। প্রথমে ধীরে, মৃদুস্বরে। তারপর সুর চড়াতে লাগল—অবশেষে সনাতনের কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

প্রহরের পর প্রহর রাত গড়িয়ে চলল। তিনটি হৃদয় যন্ত্র একই সুরে বাজতে লাগল।

ব্যোম হলো সুরময়—হৃদয় হলো কৃষ্ণময়।

সনাতন নামের সঙ্গে যে কি শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন কেউ জানে না—কিছুতেই দস্যু নাম ত্যাগ করে উঠতে পারল না।

নামের প্রভাবে তার দেহ কাঁপতে লাগল, চক্ষু হলো অশ্রুপূর্ণ, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

যখন সে আর সামলাতে পারল না, সনাতনের চরণের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—ঠাকুর আমার অপরাধ নিয়ো না—আমায় দয়া কর।

সনাতন বললেন—আমি অপরাধ ক্ষমা করবার কে? অপরাধ যাঁর ক্ষমা করবার তিনি অপরাধ ক্ষমা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন। এখন আমি যাই—রাত্রি প্রভাত হয়েছে।

—আমাকে দয়া করে তোমার সঙ্গে নাও প্রভু।

—তোমাকে সঙ্গে নিতে হবে না।

—কেন প্রভু?

—তোমার কাজ যে এখানে, আমার সঙ্গে নয়।

—আমার কি কাজ প্রভু?

—যাদের নিয়েছ এখন তাদের দাও।

—আমার যে দেবার কিছু নেই প্রভু।

—আছে, সেবা। পথিক দেখলেই সাদরে তাদের নিয়ে এসে সেবা করবে। আর দিনরাত কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপ করবে। তোমার সব পাপ মুক্ত হবে একমাত্র জীবসেবা আর কৃষ্ণনামে।

সনাতন বেরিয়ে এসে পথ ধরলেন।

দস্যু বিবশচিত্ত পড়ে রইল পেছনে।
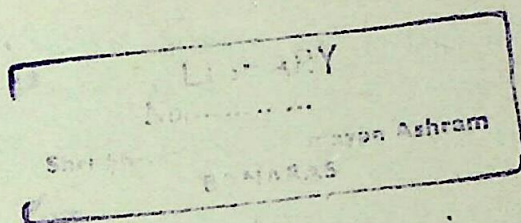
॥ ঊনিশ ॥

পথে বের হয়ে সনাতন একা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন।

ঈশান সঙ্গে সঙ্গে চলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সনাতন মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার আর আমার সঙ্গে যাওয়া হতে পারে না ঈশান।

—কেন প্রভু, দাসের অপরাধ কি?

—তুমি এখনও বিষয়-চিন্তা ছাড়তে পারনি।

—প্রভু আমায় ক্ষমা করুন।

—দুঃখিত হয়ো না ঈশান, আজও তোমার বিষয়-বুদ্ধি যায়নি।

—কিন্তু প্রভু আমি কত আশা নিয়ে—

—তোমার আশা সফল হবে ঈশান। একদিন তুমি নিশ্চয়ই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করতে পারবে। তখন শত শত লোক নিত্য তোমার পেছনে ফিরবে। কিন্তু এখন যাও।

সনাতন একা চলতে লাগলেন।

ক্রন্দনরত ঈশান পেছনে পড়ে রইলো।

দারুণ শীত। সনাতনের দেহ অর্ধনগ্ন, পথও অজানা। তবু সনাতন নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে পথ চলতে লাগলেন।

দুপুর হলে কোনও গ্রামে আশ্রয় নেন। অযাচিত ভাবে অপর্যাপ্ত খাদ্য এসে পড়ে। পশুপক্ষী যে কাছে থাকে সনাতন আগে তাদের খাওয়ান—তারপর সামান্য যা থাকে নিজে খান।

একদিন রাত্রিবেলা তিনি গ্রামপ্রান্তে এক গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন। গ্রামের নাম হাজিপুর—পাশেই শোনপুর। এইখানেই প্রতি বছর শীতের সময় ভারত বিখ্যাত হরিহর ছত্রের মেলা বসে।

হাতী-ঘোড়া, গরু মহিষ, বাঘ উট থেকে সুরু করে নানান জীবজন্তুও এই মেলায় বিক্রী হয়। তাছাড়া সোনা-রূপা থেকে লোহা-তামা, পিতল, কাঁসা সব কিছুর বেচা কেনা হয়ে থাকে।

চোর-ডাকাত, পথিক, বেশ্যা, নর্তকী, গায়িকা সব শ্রেণীর লোকই আসে মেলায়।

রাজা-জমিদার-ভূঁইয়াদেরও কিছু কেনবার প্রয়োজন হলে তাঁরা এই মেলায় আসেন।

গৌড়ের সুলতান প্রতি বছর এই মেলা থেকেই প্রচুর ভাল ভাল ঘোড়া কেনেন। অবশ্য তিনি আসেন না, আসেন তাঁর প্রতিনিধি অশ্বশালার রক্ষক শ্রীকান্ত।

এবারেও তিনি এসেছিলেন। আশ্রয় নিয়েছিলেন গ্রামপ্রান্তের একটি বাড়িতে।

হঠাৎ তিনি শুনলেন মধুর কণ্ঠের গান—

কোথায় তুমি দয়াল হরি খুঁজেও তোমার দেখা না পাই।
ওগো জগত্তারণ চরণ ছাড়া এ জগতে কিছুই না চাই॥
ও প্রভু আমার জগৎ পিতা কোথায় আছে দেখা দাও।
(আমার) দেহ মন প্রাণ সকল কিছু করুণাময় তুমি নাও॥

কণ্ঠস্বর শ্রীকান্তের কাছে বড় পরিচিত মনে হলো। কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করতে পারলেন না। কে এই গায়ক? কিন্তু যেই গান করুক, তার কণ্ঠ বড় মধুর।

একটু পরে গান শেষ হলো। শ্রীকান্ত শুনলেন গায়ক ধীর, সুমিষ্ট স্বরে স্তবপাঠ করছেন—

ত্বমাদিদেব পুরুষ পুরাণ স্তমস্য বিশ্বস্য পরম্ নিধানং
বেত্তাসি বেদঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততো কৃত্বম অনন্ত রূপম্॥
বায়ুর্যমোঽগ্নি বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেস্তু সহস্র কৃত্ব পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

এবারে আর কোন সংশয় নেই।

একটা আলো নিয়ে তিনি কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দ্রুতপায়ে ছুটে চললেন।

গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তা জীবনে বোধ হয় কখন স্বপ্নেও ভাবেন নি। দেখলেন এক বটবৃক্ষের মূলে গৌড়ের উজীর ধূলিশয্যায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় শায়িত রয়েছেন।

তাঁর নয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। চোখের জলে বসুন্ধরা সিক্ত। মুদ্রিত নয়নে কাঁপতে কাঁপতে সনাতন বলছিলেন —হে বিশাল, হে বিরাট, তুমি মূর্তি পরিগ্রহ করে আমার সামনে এসে দেখা দাও। হে সগুণ সচ্চিদানন্দ তুমিই আমার স্বামী, আমার পিতা মাতা ভ্রাতা সখা বন্ধু—তুমিই আমার সর্বস্ব।

শ্রীকান্ত ডাকলেন—উজীর সাহেব!

সনাতনের যোগ ভঙ্গ হল। তিনি চোখ মেলে ধীরে ধীরে চাইলেন।

দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীকান্ত। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বললেন—আমি আর উজীর নই ভাই, সনাতন।

—আচ্ছা সনাতন তোমার এ বুদ্ধি হলো কেন?

—এতদিন হয়নি কেন. তাই বলছ? কি করব ভাই তিনি যখন যেমন বুদ্ধি দেন তখন তেমনি করি।

—গৌড়ের উজীর আজ ধূলিশয্যায়! ওঠ ওঠ ভাই, চল, আমার ঘরে চল।

—তাঁর হুকুম না পেলে ত আমি যেতে পারব না।

—এখন কোথায় তাঁর দেখা পাবে?

—দেখা পেতে হয় না ভাই, তিনি সব সময় আমার বুকের ভেতর থেকে আমায় আদেশ করছেন।

—প্রভু দয়াল। তিনি কখনও এমন আদেশ করতে পারেন না যে তুমি গাছের তলায় পড়ে শীতে কষ্ট পাও।

—তিনি নিজেও যে এম্‌নি করে এর চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন শ্রীকান্ত দাদা।

—তাঁর আবার কষ্ট কি ? তিনি ত সাক্ষাৎ ভগবান।

—ভগবানকে পেতে হলে কি রকম করে কষ্ট করতে হয় কত-দুঃখ বরণ করতে হয়, তা তিনি নিজে আচরণ করে জগৎকে দেখাচ্ছেন।

—তোমার সঙ্গে কথায় কোন দিনই পারিনি, এখনও পারব না। ভাল, তোমার জন্যে না হয় এইখানেই শয্যা আনিয়ে দিই ?

—ছি, শয্যাতে শয়নই যদি করব তবে এখানে কেন ?

—তাহলে গায়ের একটা কাপড় ?

—ক্ষমা কর।

—আমার এই শালখানি নাও।

—ছি, ছি, কি যে বল—

—আচ্ছা, তাহলে একটা কম্বল ?

সনাতন আপত্তি করলেন না। তিনি ধীর স্বরে শুধু বললেন —হা কৃষ্ণ করুণাময়—

—কিছু খাবার আনব ?

—একখানি রুটি।

শ্রীকান্ত কিন্তু মনে মনে খুব রেগে গেলেন। ভাবলেন, ওকে এখান থেকে ফেরাব তবে আমার নাম শ্রীকান্ত। গাছতলায় পড়ে না থাকলে কি ভগবান পাওয়া যায় না ? এ আবার কি ঢং ? উপযুক্ত ওষুধ দিতে হবে।

নিজের মনেই চিন্তা করতে করতে তিনি চলে গেলেন। খাদ্য আর কম্বল পাঠিয়ে দিয়ে তিনি মনে মনে এক ফন্দী আঁটলেন।

কয়েকজন অনুচরকে ডেকে তাদের সঙ্গে কি যেন যুক্তি করলেন। তারপর তাদের কয়েকটি নির্দেশ দিলেন।

এদিকে কম্বল পেয়ে সনাতন কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। তারপর সেটি গায়ে দিয়ে রুটিটি প্রভুকে নিবেদন করলেন।

প্রসাদ খেয়ে সনাতন আবার গুণ গুণ করে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।

নাম করতে করতে কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে খুব কাছেই কোথায় বাঘের গর্জন শোনা গেল। সনাতন প্রথমে একটু চম্‌কে উঠলেন—তারপর আগের মতই কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন।

গর্জনের পর গর্জন। সনাতন কিন্তু নির্বিকার। গ্রামের ভেতর একটা প্রচণ্ড সোরগোল শোনা গেল—ওই বাঘ এসেছে, পালা, পালা।

সনাতন উঠলেন না। নাম-গানও বন্ধ করলেন না। বাঘ তখন দূরে সরে গেল—ক্রমে তার গর্জন আর শোনা গেল না।

একটু পরে নারীকণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল—ওগো, আমায় রক্ষা কর, আমায় খেয়ে ফেললে গো—

সনাতন তখন কম্বল ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

চকিতে একটা বৃক্ষ শাখা ভেঙে নিয়ে শব্দ অনুসরণ করে ছুটলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন মাঠের ওপর ধূলোয় পড়ে এক ভদ্রলোক ছটফট করছে।

সনাতন দেখলেন, একটা কি যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। হয়ত বা বাঘ!

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

স্ত্রীলোকটি কাতর কণ্ঠে উত্তর দিল—আমায় বাঘে ধরেছিল, অংগ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

সনাতন হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসলেন। দেখলেন স্ত্রীলোকটি সুন্দরী ও যুবতী। তা দেখে তিনি চমকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন —যাই, আমি গাঁ থেকে লোক ডেকে আনি।

নারী বলল—আমায় বাঘের মুখে ফেলে পালিও না। তুমি আমায় নিয়ে চল।

—ক্ষমা কর মা, আমি সন্ন্যাসী। স্ত্রীলোক-স্পর্শ আমায় করতে নেই।

এমন সময় কে একজন চীৎকার করে বলে উঠল—কে, কে ওখানে? কোন্ বদমায়েস স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট করছে?

বলতে বলতে তিনটি লোক দ্রুত পায়ে লাঠি হাতে সনাতনের কাছে এগিয়ে এলো।

সনাতন ধীর ভাবে বললেন—কেউ কারও ইজ্জত নষ্ট করেনি ভাই। স্ত্রীলোকটিকে বাঘে ধরেছিল, চীৎকার শুনে ছুটে এসেছি। এখন তোমরা একে ঘরে নিয়ে যাও, আমি চল্‌লুম।

একজন আগন্তুক বলল—যাবে কোথায়, দাঁড়াও।

তারপর স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বলল—তোমার ইজ্জত নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল না?

নারী মৃদু কণ্ঠে বলল—হ্যাঁ।

সনাতন বলল—সত্য কথা কি বলছ মা?

নারী আর কোনও কথা বলল না। দ্বিতীয় আগন্তুক লাঠি মাটিতে ঠুকে বলল—এই আওরৎ হামার বহিন, তুমি একা পেয়ে তাকে বেইজ্জত করেছো, হামি তোমাকে মারবে।

সনাতন তা শুনে হেসে বললেন—বেশ মারো।

স্ত্রীলোকটি উঠে বসলো। তার বসন সংযত করে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটিকে যে বাঘে ধরেছিল তা মনে হলো না।

ব্যাপারটা বুঝতে বুদ্ধিমান সনাতনের দেরী হলো না। তিনি ধীর পায়ে তাঁর আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় আগন্তুক তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল।

সনাতনের ইচ্ছা হলো, তিনি গাছের ডাল দিয়ে তাদের প্রহার করেন। দেহেও তাঁর অপরিসীম শক্তি। কিন্তু অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সংযত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবলেন—ছি, ছি, এখনও ক্রোধ! আমাকে যে তৃণের চেয়েও হীন হতে হবে, 'তৃণাদপি স্থনীচেন'।

প্রকাশ্যে তিনি বললেন—আমার কাছে তোমরা কি চাও? মারতে চাও? মার। যাতে তোমরা স্থখ পাও, তাই কর।

তখন তৃতীয় লোকটি এগিয়ে গেল।

সে এতক্ষণ নীরবে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সনাতনের পায়ে পড়ল। বলল—ভাই সনাতন, আমায় ক্ষমা কর। আমি মহাপাপী, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমি এই চক্রান্ত করেছিলাম। দেখলাম, তুমি নির্ভীক—তুমি চিত্তজয়ী, ক্রোধ-শূন্য। ষড়রিপু যার বশীভূত, সেই ত দেবতা। অন্য দেবতা আমি জানি না। সনাতন, ভাই, দেবতা, আমায় ক্ষমা কর।

সনাতন বললেন—ভগবান, তোমায় ক্ষমা করুন শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্ত বলল—আমি অন্ধ, মুর্খ, তাই তোমার মত লোককেও পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম তুমি চিরদিনই সব বিষয়ে সকলের চেয়ে বড়। রাজকার্যে, বৈরাগ্যে, সন্ন্যাসে, সব বিষয়ে তুমি অদ্বিতীয়। তোমার জয় হোক, তোমার নাম সারা বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে বিরাজ করুক।

সনাতন কোনও কথা বললেন না। নীরবে নিজের স্থানে গিয়ে চুপ করে বসে মুদ্রিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

॥ কুড়ি ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কয়েকদিন মাত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করে কাশীতে ফিরে এসেছেন।

আগে যেমন তিনি চন্দ্রশেখরের বাড়িতে বাস করতেন আর তপন মিশ্রের বাড়িতে ভিক্ষা করতেন, দ্বিতীয়বার এসেও তিনি তেমনি করতে লাগলেন।

বারানসী ধামে ফিরে আসার দিন দুই পরে একদিন প্রভু চন্দ্রশেখরকে বললেন—চন্দ্রশেখর, বাইরে একজন বৈষ্ণব বসে রয়েছেন, তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রভু ভেতরের ঘরে নির্জনে বসেছিলেন। সদর দরজার ওপর সনাতন বসে প্রভুর চরণ ধ্যান করছিলেন।

চন্দ্রশেখর এসে দেখলেন, বৈষ্ণব কেউ নেই, তবে একজন লোক একটি কম্বল গায়ে দিয়ে এক পাশে নীরবে বসে আছে। তিনি ফিরে গিয়ে প্রভুকে বললেন—কই, দ্বারে ত কোন বৈষ্ণব নেই।

—তুমি কি দ্বারে কাউকে দেখলে না?

—একজন দরবেশকে দেখলাম।

—তাঁকেই নিয়ে এস।

চন্দ্রশেখর আবার বাইরে এলেন। সনাতনকে বললেন—প্রভু আপনাকে ডাকছেন।

সনাতন ভাবলেন, চন্দ্রশেখর বুঝি অন্য কোনও লোককে কথাটা

বসছেন। তাঁকে যে প্রভু ডাকছেন, এ তিনি ধারণাই করতে পারেন নি। পেছন ফিরে তিনি দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। বললেন—প্রভু কাকে ডাকছেন?

—আপনাকে।

—কথাটা সনাতনের বিশ্বাস হলো না। বললেন—আপনি দয়া করে আবার জিজ্ঞেসা করে আসুন। আপনার শুনতে ভুল হয়ে থাকবে। আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে প্রভু ডাকবেন কেন?

—যে জগতের কাছে হেয়, ঘৃণ্য. তাকেই ত প্রভু বুকে ধরেন।

সনাতন তখন কাঁপতে লাগলেন। তাঁর দুচোখ বেয়ে বারিধারা ছুটল। ধ রণী অশ্রুজলে সিক্ত হলো। সনাতন কম্পিত দেহে যুক্ত-করে চন্দ্রশেখরকে অনুসরণ করলেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দূর থেকে, প্রভুকে দর্শন করা মাত্র তিনি ধুলোর ওপর অবলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

প্রভু তখন হাসি মুখে সনাতনকে আলিঙ্গন করবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

সনাতন তা দেখে তাড়াতাড়ি পেছনে সরে গেলেন। সকাতরে দুটি হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—আমায় স্পর্শ করবেন, না প্রভু—আমি যে মহাপাপী—মহা পাতকী। আমি সাধুমাত্রের কাছেই অতি ঘৃণ্য, অতি জঘন্য। আমার এই পাপময় দেহ স্পর্শ করে নিজেকে কলংকিত করবেন না।

প্রভু বললেন—তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে অশেষ কৃপা সনাতন —তাই তোমায় তিনি বিষয় কূপ থেকে উদ্ধার করলেন। কৃষ্ণভক্তিতে তোমার দেহ নিষ্পাপ হয়েছে তাই আমি তোমায় স্পর্শ করে পবিত্র হবো।

প্রভু দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সনাতনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

সনাতন কেঁপে উঠলেন, তার পরেই অচৈতন হয়ে পড়লেন।

প্রভু সেই সুযোগে তাঁর দেহে শক্তি সঞ্চার করলেন।

কিছুক্ষণ পরে সনাতন চৈতন্যলাভ করে কম্বল খানি গায়ে টেনে নিলেন। সনাতনের গায়ের কম্বল প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রভু হয় ত ভাবলেন, সনাতনের বিষয়-আসক্তি এখনও সম্পূর্ণ যায়নি।

সনাতন সব ত্যাগ করেছেন—স্ত্রী, ঘর সংসার রাজার মস্ত সম্মান অতুল সম্পদ, সব ত্যাগ করে একখানি কম্বল শীত নিবারণ করবার জন্যে গায়ে দিয়েছেন। তাও প্রভুর সহ্য হলো না। তিনি বারবার কম্বলখানির দিকে তাকাতে লাগলেন।

সনাতন যে দৃষ্টির অর্থ বুঝলেন।

বুঝে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে গিয়ে এক বৈষ্ণবকে কম্বল খানি দিয়ে তাঁর ছেঁড়া কাঁথাখানি চেয়ে নিলেন।

এবারে প্রভু সদয় হলেন। রাজাকে রাজবেশ ছাড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া বসন পরিয়ে পথের ভিখারীর অধম করে প্রভু প্রসন্ন হলেন।

তখন তিনি আবার আলিঙ্গন করে সনাতনকে বললেন—সনাতন তোমার দৈন্য দেখে বুক ফেটে যায়। আজ আমি মুগ্ধ হয়েছি।

যমুনাতীর্থ নামে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ঠিক সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

তিনি দূর থেকে প্রভুকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে প্রভুকে দেখতে লাগলেন, আমার ঠিক যে ভাবে দেব বিগ্রহ দর্শন করি ঠিক সেই ভাবে।

প্রভু তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু তিনি আসন না নিয়ে তপন আর চন্দ্র শেখরের কাছে গিয়ে মাটির ওপর বসলেন।

প্রভু তখন সনাতনকে চার যুগের ধর্ম তত্ত্বের বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যমুনাতীর্থ ধনী সরল ও ভক্ত। আজীবন তিনি

সাধু খুঁজে বেড়িয়েছেন। যাঁকে যখন বড় মনে করেছেন তাঁকেই তিনি নানা খাদ্য, সিদ্ধি, গাঁজা ইত্যাদি দিয়েছেন—তাঁর সেবা করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।

এতদিন তিনি সন্ন্যাসী শিরোমণি প্রকাশানন্দকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি পূজা করেছেন। কিন্তু যেদিন তিনি প্রভুকে দেখলেন সেইদিন থেকেই তিনি মন-প্রাণ প্রভুর চরণে উৎসর্গ করে তাঁর দাসানুদাস হয়ে রইলেন।

কিন্তু তার বড় দুঃখ যে মহাজ্ঞানী ও গর্বী প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে চিনলেন না, বুঝলেন না।

প্রকাশানন্দের দশ হাজার সন্ন্যাসী শিষ্য। তিনি বেদে অদ্বিতীয় যশে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অজস্র তাঁর সম্মান, ভারতব্যাপী তাঁর প্রতিপত্তি।

বিদ্যা আর জ্ঞানের তীর্থ বারাণসীর যদি কেউ একচ্ছত্র সম্রাট থাকেন তবে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতী।

কিন্তু ইনি প্রভুর প্রবল শত্রু। কাউকেই তিনি প্রভুর কাছে আসতে দেন না। প্রভুর নানা অপযশ করে তিনি সকলকে নিরস্ত করেন।

যমুনাতীর্থের বিশ্বাস, যদি কখনও প্রকাশানন্দ প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন করেন, তবে প্রভুর প্রতি আর তাঁর বিরাগ থাকবে না, থাকতে পারে না। এমন দয়াল ঠাকুরকে দেখলে পাষাণও যে গলে যায়! তাই তিনি তপন মিশ্রকে বললেন—প্রভুর নিন্দা আর সহ্য হয় না।

তপন বললেন—সহ্য না করে উপায় কি?

—কিন্তু তারা বলে কৃষ্ণচৈতন্য একটা মুর্খ সন্ন্যাসী। বেদ পাঠ ছেড়ে সে কেবল নৃত্য গীত করে। তার একটা মানুষ ভোলান শক্তি আছে। অত বড় পণ্ডিত নীলাচলের বাসুদেব সার্বভৌমকে সে ভুলিয়েছে। সে তার কাছে যায় তাকেই ভুলোয়

কেউ তার কাছে যায় না। প্রভু ত এসব নিন্দা শুনে কেবল হাসেন। কিন্তু আমাদের যে প্রাণে লাগে।

আমাদের প্রাণে লাগলে প্রভুর প্রাণেও লাগে। তিনি কি কখনও ভক্তের ব্যথা দেখে স্থির থাকতে পারেন,

—তাই একটা ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

—ব্যবস্থা যদি চাও তবে এই গৌড়ের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো। তিনি রাজনীতিবিদ মন্ত্রণা ভাল দিতে পারবেন।

এদিকে সনাতন তখন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন—

'শুক্ল, পীত তথা রক্ত ইত্যাদিক করি।
যুগে যুগে অবতার করেন শ্রীহরি।
তিন যুগে যে যে অবতার তা কহিলে,
পীতবর্ণ কলিতে কে, তাহা না বলিলে।'—ভক্তমাল গ্রন্থ

এ কথা শুনে প্রভু মৃদু হাসলেন। বললেন—সনাতন চাতুরালি ছাড়ো।

এই বলে তিনি উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

এদিকে ভক্তদের মিথ্যে একটা পরামর্শ চুপি চুপি চলছিল। চুপি চুপি, কারণ সর্বজ্ঞ ভগবান পাছে শুনতে পান! ব্রজ গোপিনীদেরও ও বুঝি এমনি ভুলই একদিন হয়েছিল—তাই তাঁরা সর্বব্যাপী শ্রীভগবানের কাছে তাঁদের নগ্নদেহ লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন।

চন্দ্রশেখর সব কথা সনাতনকে খুলে বললেন। তারপর বললেন—দেখ এই মহাগর্বী প্রকাশানন্দ, এর দর্প চূর্ণ না হলে আমরা শান্তি পাচ্ছি না। যেখানে সেখানে সে প্রভুর নিন্দা করে বেড়ায় সে সব কথা শেলের মত আমাদের বুকে বাজে স্বীকার করি প্রকাশানন্দ মস্ত বড় পণ্ডিত—তাঁর দশ হাজার শিষ্য সেবক আছে। তাই বলে প্রভুর নিন্দা করবার তাঁর কি অধিকার? আমাদের যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সনাতন বললেন—প্রভুকে আপনারা কিছু বলেছেন ?

—বলেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

—প্রভু কি বলেছেন ?

—কিছু বলেননি, শুধু একটু হেসেছেন।

—তা হলে প্রকাশানন্দের মুক্তি বেশি দূর নয়।

—আপনি কি তাই মনে করেন ?

—আমি মনে করি সেই অজ্ঞান জ্ঞানগর্বী শিগ্‌গীরই প্রভুর কৃপা লাভ করবেন।

যমুনাতীর্থ ব্যাকুলভাবে বললেন—কি করা যায় তার একটা উপদেশ দিন। আমরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না।

সনাতন বললেন—প্রভু কি প্রকাশানন্দকে কখনও দেখেছেন ?

—পরস্পর কেউ কাউকে দেখেননি।

—আমার মনে হয়, দুজনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ ঘটলেই প্রকাশানন্দ মুক্ত হবেন।

—তা বুঝি। কিন্তু সাক্ষাৎ কি করে ঘটবে ? প্রকাশানন্দ প্রভুর কাছে আসবে না—প্রভুকেও বলা যায় না, আপনি প্রকাশানন্দের আশ্রমে চলুন। সুতরাং দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ হবার কোন আশা নেই।

সনাতন হেসে বললেন—আপনি কিছু অর্থ ব্যয় করে পুণ্য সঞ্চয় করতে প্রস্তুত আছেন কি ?

যমুনাতীর্থ বললেন—আমার যথাসর্বস্ব ব্যয় করতেও আমি প্রস্তুত আছি।

—আপনি কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা গ্রহণের জন্যে নিমন্ত্রণ করুন। আর প্রভুরও চরণে ধরে তাঁকে আহ্বান করুন।

—প্রভু যাবেন কি ?

—যাবেন—নিশ্চয় যাবেন। প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করতে যাবেন। প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করতেই তিনি কাশীতে এসেছেন।

—তা আপনি কি করে বুঝলেন ?

—আমার নিজের দৃষ্টান্ত দেখে। আমাকে কৃপা করতে প্রভু নীলাচল থেকে এসেছিলেন।

বলতে বলতে সনাতনের চোখ অশ্রুপূর্ণ হলো।

চন্দ্রশেখর বললেন—পরামর্শ অতি উত্তম—আমার বেশ মনে ধরেছে। তবে এখন হঠাৎ কিছু করা হবে না। আমার মনে হয়, প্রভু এখন কিছুকাল এখানেই অবস্থান করবেন। তাড়াতাড়ি করলে সব পণ্ড হতে পারে।

তপন মিশ্র বললেন—প্রভুর অনুমতি নেবে কে ?

চন্দ্রশেখর বললেন—সে ভার সনাতনের ওপর রইল।

সনাতন বললেন—আমার বল, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা সবই প্রভু। আমি অতি ক্ষুদ্র, কীটানুকীট।

এমন সময় ঘরের মধ্যে একটি অপরিচিত লোক প্রবেশ করল! তাকে দেখলেই মনে হয় এ লোকটি উন্মাদ। দাড়ি, চুলে সারা মুখ প্রায় সমাচ্ছন্ন। পরণে মলিন বস্ত্র, খালি গা, চুল রুক্ষ, কিন্তু চোখ জ্যোতির্ময়।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বলল—আমার শ্যামসুন্দর কই ?

চন্দ্রশেখর বললেন—কি চাও, ভিক্ষা ?

—আমি শ্যামসুন্দরকে চাই।

ভিক্ষা চাও অপেক্ষা কর—গোল করলে প্রভু বিরক্ত হবেন।

—প্রভু ? কে তোদের প্রভু ? তোরা চাকরী করিস নাকি ?

চন্দ্রশেখর বললেন—লোকটা দেখছি উন্মাদ।

সনাতন বললেন—উন্মাদ নয়, লোকটি দিব্য উন্মাদ।

উন্মাদ তখন নাচতে নাচতে গান ধরল।

গান গাইতে গাইতে ভাবে ঢলে পড়ল। কোমলতা-মাখান চোখদুটি আনন্দে যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। ধূলিধূসরিত অঙ্গ থেকে যেন অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

গান গেয়ে সে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল—কই কোথায় আমার প্রাণের শ্যামসুন্দর? তুমি এলে না প্রভু? কোথায় আমার হৃদয় আলো করা ধন?

উন্মাদ কেঁদে আকুল হল।

তার চোখ কাঁদছে, বদন কাঁদছে, সারাটা দেহ যেন কেঁদে আকুল হচ্ছে। তেমন কান্না কাঁদতে তাঁরা কেউ দেখেননি।

তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন—কিন্তু কেন যে কাঁদছেন কেউ জানেন না—বোঝেন না।

শুধু যেন প্রবাহের সঙ্গে প্রবাহ মিশিয়ে দিয়েছেন। ঘর বাড়ি কাঁদছে—বৃক্ষলতা কাঁদছে, নিচে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁদছে।

এই কান্নার রোলের মধ্যে হঠাৎ প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। আহুত হয়ে তাঁকে আসতে হলো।

তাঁকে দেখেই উন্মাদ মহানন্দে হুংকার দিয়ে উঠলেন। তার কান্না যেন মুহূর্তে বন্ধ হলো। তার সারা দেহ যেন হেসে উঠল। প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত যেন আনন্দে কণ্টকিত হলো।

প্রভুকে ঘিরে সে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে বলল—তুমি এসেছ আমার প্রাণ বঁধুয়া? আমার সারাটা হৃদয় আলো করে এসেছো? আমি যে যুগ যুগান্ত ধরে তোমাকে দর্শন করবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।

প্রভু তখন কম্পিত কলেবর—গলদশ্রুলোচন।

উন্মাদ দুপা সরে গিয়ে একদৃষ্টে প্রভুকে দেখতে লাগল। সে দেখার যেন শেষ নেই—বিরাম নেই।

প্রভু কোনও উত্তর দিলেন না—কোন কথা বলতে পারলেন না।

উন্মাদ যেন সারা হৃদয় উজাড় করে প্রভুকে দেখছে—প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে প্রভুকে দেখছে।

দেখে দেখে যখন প্রাণ ভরে উঠল, তখন প্রভুকে বলল—ওগো

—তা আপনি কি করে বুঝলেন ?

—আমার নিজের দৃষ্টান্ত দেখে। আমাকে কৃপা করতে প্রভু নীলাচল থেকে এসেছিলেন।

বলতে বলতে সনাতনের চোখ অশ্রুপূর্ণ হলো।

চন্দ্রশেখর বললেন—পরামর্শ অতি উত্তম—আমার বেশ মনে ধরেছে। তবে এখন হঠাৎ কিছু করা হবে না। আমার মনে হয়, প্রভু এখন কিছুকাল এখানেই অবস্থান করবেন। তাড়াতাড়ি করলে সব পণ্ড হতে পারে।

তপন মিশ্র বললেন—প্রভুর অনুমতি নেবে কে ?

চন্দ্রশেখর বললেন—সে ভার সনাতনের ওপর রইল।

সনাতন বললেন—আমার বল, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা সবই প্রভু। আমি অতি ক্ষুদ্র, কীটানুকীট।

এমন সময় ঘরের মধ্যে একটি অপরিচিত লোক প্রবেশ করল! তাকে দেখলেই মনে হয় এ লোকটি উন্মাদ। দাড়ি, চুলে সারা মুখ প্রায় সমাচ্ছন্ন। পরণে মলিন বস্ত্র, খালি গা, চুল রুক্ষ, কিন্তু চোখ জ্যোতির্ময়।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বলল—আমার শ্যামসুন্দর কই ?

চন্দ্রশেখর বললেন—কি চাও, ভিক্ষা ?

—আমি শ্যামসুন্দরকে চাই।

ভিক্ষা চাও অপেক্ষা কর—গোল করলে প্রভু বিরক্ত হবেন।

—প্রভু ? কে তোদের প্রভু ? তোরা চাকরী করিস নাকি ?

চন্দ্রশেখর বললেন—লোকটা দেখছি উন্মাদ।

সনাতন বললেন—উন্মাদ নয়, লোকটি দিব্য উন্মাদ।

উন্মাদ তখন নাচতে নাচতে গান ধরল।

গান গাইতে গাইতে ভাবে ঢলে পড়ল। কোমলতা-মাখান চোখদুটি আনন্দে যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। ধূলিধূসরিত অঙ্গ থেকে যেন অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

গান গেয়ে সে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল—কই কোথায় আমার প্রাণের শ্যামসুন্দর? তুমি এলে না প্রভু? কোথায় আমার হৃদয় আলো করা ধন?

উন্মাদ কেঁদে আকুল হল।

তার চোখ কাঁদছে, বদন কাঁদছে, সারাটা দেহ যেন কেঁদে আকুল হচ্ছে। তেমন কান্না কাঁদতে তাঁরা কেউ দেখেননি।

তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন—কিন্তু কেন যে কাঁদছেন কেউ জানেন না—বোঝেন না।

শুধু যেন প্রবাহের সঙ্গে প্রবাহ মিশিয়ে দিয়েছেন। ঘর বাড়ি কাঁদছে—বৃক্ষলতা কাঁদছে, নিচে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁদছে।

এই কান্নার রোলের মধ্যে হঠাৎ প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। আহূত হয়ে তাঁকে আসতে হলো।

তাঁকে দেখেই উন্মাদ মহানন্দে হুংকার দিয়ে উঠলেন। তার কান্না যেন মুহূর্তে বন্ধ হলো। তার সারা দেহ যেন হেসে উঠল। প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত যেন আনন্দে কণ্টকিত হলো।

প্রভুকে ঘিরে সে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে বলল—তুমি এসেছ আমার প্রাণ বঁধুয়া? আমার সারাটা হৃদয় আলো করে এসেছো? আমি যে যুগ যুগান্ত ধরে তোমাকে দর্শন করবার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।

প্রভু তখন কম্পিত কলেবর—গলদশ্রুলোচন।

উন্মাদ দুপা সরে গিয়ে একদৃষ্টে প্রভুকে দেখতে লাগল। সে দেখার যেন শেষ নেই—বিরাম নেই।

প্রভু কোনও উত্তর দিলেন না—কোন কথা বলতে পারলেন না।

উন্মাদ যেন সারা হৃদয় উজাড় করে প্রভুকে দেখছে—প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে প্রভুকে দেখছে।

দেখে দেখে যখন প্রাণ ভরে উঠল, তখন প্রভুকে বলল—ওগো

আমার শ্যামসুন্দর, তুমি ত তেমনি শ্যামই আছ। লোকে বলে তুমি নাকি নদেয় লীলা করতে এসে গৌর হয়েছ, বাঁশী ছেড়ে নাকি দণ্ড ধরেছ। পীতধড়া ছেড়ে নাকি রক্তবসন পরেছ। কই গো, তুমি ত কিছুই 'ছাড়নি, তুমি ত গোরা হওনি। তুমি ত তেমনি আছ—সেই শ্যামই আছ।

বলতে বলতে উন্মাদ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

প্রভু তখন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। প্রভুর দুচোখ দিয়ে অঝোর ধরে জল গড়িয়ে পড়ল।

কোনও সাবধানতার প্রয়োজন হল না। প্রভু কাউকে সে দেহ স্পর্শ করতে দিলেন না।

উন্মাদ জ্ঞান লাভ করে দেখল, সে প্রভুর কোলে শুয়ে রয়েছে।

তখন যে সলজ্জ ভাবে উঠে বসল। একটু সময় প্রভুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে একদিকে ছুটে চলে গেল।

তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলেন চন্দ্রশেখর ও অন্য দু'একজন ভক্ত। প্রভু তাঁদের ইংগিতে নিষেধ করলেন।

সনাতন প্রশ্ন করলেন—উনি কে প্রভু?

প্রভু শুধু হাসলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

সবাই বুঝল প্রভু তাঁর পরিচয় এখন ব্যক্ত করতে চান না—পরে জানাবেন। কেউ আর কোন কথা বলল না, এ বিষয়ে।

॥ একুশ ॥

যমুনাতীর্থের বাসনা পূর্ণ হলো। প্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সশিষ্য তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন।

প্রভুর ভক্তেরা মহানন্দে কোলাহল করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের মনের কোণ একটু উৎকণ্ঠা জেগে রয়েছে।

সনাতনের মনে কিন্তু কোনও চিন্তা বা উদ্বেগ নেই। তিনি স্থির জানেন আজ প্রকাশানন্দের মুক্তি।

তখনকার দিনে পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সমাজের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী।

তিনি অদ্বৈতবাদী। নিজকেই ভগবান বলে জানেন—সুতরাং ভক্তি তত্ত্ব তাঁর কাছে অপরিচিত।

'যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামান্য,
আপনারে জানে ইষ্ট ব্রহ্মেতে অভিন্ন।
ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম নাহি জানে,
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥'

এদিকে প্রভু ভক্তির উৎস। প্রকাশানন্দ পাণ্ডিত্যাভিমানী প্রভু তৃণাদপি সুনীচ। প্রকাশানন্দ দাম্ভিক, প্রভু বিনয়ী। একজন নিজেকে ভগবান মনে করেন, অন্যজন নিজেকে দাস মনে করেন।

পরস্পর বিরোধী ভাব নিয়ে আজ দুই মহাপুরুষ একই সভায়

উপস্থিত। একজন হিংসা আর দ্বেষ নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দীকে ধ্বংস করতে উৎসুক অন্যজন ক্ষমা ও অপার করুণা নিয়ে প্রতিদ্বন্দীকে উদ্ধার করবার প্রয়াসী।

যমুনাতীর্থের বিরাট গৃহ প্রাঙ্গণ।

চন্দ্রতপের নিচে প্রকাশানন্দ, সহস্রাধিক শিষ্য সহ উপবিষ্ট।

সকলেই শুনেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই বৃহৎ সভাতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রভুর প্রতীক্ষা করছেন।

হঠাৎ দূরে দেখা গেল, এক জ্যেতির্ময় দীর্ঘকায় মহাপুরুষ স্বর্ণের মত উজ্জল প্রভা চারদিকে বিকীর্ণ করতে করতে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন।

কেউ কেউ ভাবলেন, এত জ্যোতি কেন? ইনি কি আমাদের মত মানুষ নন? মানুষে কি এত জ্যোতি সম্ভব?

প্রভু গজেন্দ্র গমনে অবনত বদনে মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করতে করতে অগ্রসর হলেন। পেছনে সনাতন প্রভৃতি চারজন ভক্ত।

প্রভুর হাস্যময় বদন কমল। নয়নে সলাজ মধুময় ভাব। উজ্জ্বল সুদীর্ঘ দেহ সকলকেই বিমোহিত করল।

প্রভু এসে ধীর পায়ে চন্দ্রাতপের নিয়ে দাঁড়ালেন—তারপর যুক্তকরে সমবেত সন্ন্যাসীদের নমস্কার করলেন। পরে চন্দ্রাতপের বাইরে যেখানে পদ প্রক্ষালনের স্থান ছিল, সেখানে উপবেশন করলেন।

প্রকাশানন্দ বিচলিত হলেন। প্রভু অপবিত্র স্থানে বসে থাকবেন এ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সশিষ্য উঠে দাঁড়ালেন। প্রভুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—শ্রীপাদ সভার মধ্যে আগমন করুন। এ অপবিত্র স্থানে কেন?

প্রভু বললেন—আমি আপনাদের মধ্যে বসবার উপযুক্ত নই —আমার সম্প্রদায় হীন।

প্রকাশানন্দ বললেন—আমি জানি আপনি মহাত্মা কেশব ভারতীর শিষ্য। সম্প্রদায় হীন হলেও আপনি হীন নন। সভার মধ্যে উঠে এসে বসুন।

একথা বলে প্রকাশানন্দ হাত ধরে স্নেহ ও আদরের সঙ্গে তাঁকে সভার মাঝখানে এনে বসালেন। অজস্র নক্ষত্রের মাঝখানে চন্দ্রের মতো প্রভু নিজ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর অঙ্গের পদ্মগন্ধ চারিদিক আমোদিত করে তুলল।

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীপাদ আপনি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না কেন?

প্রভু বিষণ্ণ বদনে একবার প্রকাশানন্দের দিকে চেয়েই মাথা নিচু করে রইলেন। মুখের ভাবে জানালেন, আমি অতি হীন, তাই আপনাদের সঙ্গে মিশতে সাহস করি না।

সন্ন্যাসীরা মুগ্ধ হলেন।

প্রকাশানন্দের মনেও আগের সে বৈরীভাব আর নেই। একটা অনাস্বাদিত বাৎসল্য এসে যেন তাঁর হৃদয়কে অভিসিঞ্চিত করল।

প্রকাশানন্দ বললেন—যদি অনুমতি হয় ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

প্রভু হাত জোড় করে বললেন—স্বচ্ছন্দে করুন আপনি আমার গুরুস্থানীয় আমি আপনার সন্তানের মতো।

এবারে সরস্বতী বিগলিত হলেন। একটু ভেবে তিনি বললেন—আপনি সন্ন্যাসী হয়েও বেদ পাঠ করেন না কেন? আর শুনতে পাই সন্ন্যাসীদের পক্ষে যা নিন্দনীয়, অত্যন্ত গর্হিত কর্ম আপনি সেই নৃত্যগীত ইত্যাদি ভাবকালিতে নিমগ্ন থাকেন। আপনি জগৎ বরেণ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত—আপনার নিন্দা শুনলে মনে বড় ব্যথা পাই। তাই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি এ সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ আচার আচরণে প্রবৃত্ত কেন?

সারা সভায় অসীম নীরবতা।

প্রভুর কথা শোনবার অন্যে সকলে একান্তভাবে উদ্‌গ্রীব।

করুণাঘন দৃষ্টিতে প্রভু সভার চারদিকে একবার তাকালেন। তারপর অবনতবদনে সকরুণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন —শ্রীপাদ আমি যখন আমার গুরুর কাছে দীক্ষা নিলাম, তখন তিনি দেখলেন যে আমি মূর্খ, আমার দ্বারা বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি অধীত হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তা দেখে তিনি বললেন—বাপু হে তুমি মূর্খ, বেদ বেদান্ত পড়তে পারবে না, সেজন্যে দুঃখিত হয়ো না। তার পরিবর্তে আমি তোমাকে বেদের সার একটি শ্লোক দিচ্ছি। তুমি এই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করলেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। বলে তিনি 'বৃহন্নারদীয় পুরাণ' থেকে অপূর্ব একটি শ্লোক আমায় দিলেন—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

বলে প্রভু শ্লোকের ব্যাখ্যা করলেন—এই কলিযুগে জীবের হরিনাম ভিন্ন আর অন্য কোদ গতি নেই—কোন গতি নেই। অর্থাৎ যোগ যাগ পূজা অর্চনা তপস্যা এ সবে কিছুই হবে না, কেবলমাত্র হরিনামে সিদ্ধ কাম হবে। অন্য কোন সাধন দেবদেবী পূজা, ধ্যান ধারণা কিছুতেই জীবের উদ্ধার সম্ভবপর নয়। এক হরিনামই মহামন্ত্র—হরিনামই জীবের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

করুণ স্বরে অশ্রু পূর্ণ নয়নে প্রভু শ্লোক পাঠ করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। শুনতে শুনতে শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয় দ্রবীভূত হল।

প্রভু বলতে লাগলেন—গুরুদেব হরিনাম দিয়ে আমাকে বললেন দেখ বাপু, কলিকালে আয়ু কম—হরিনাম ছাড়া স্বল্পায়ুর দিনে জীবের আর গতি নেই অতএব তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর, তোমায় আর কিছুই করতে হবে না।

আমি গুরুদেবের আজ্ঞামত সেই থেকে কৃষ্ণনাম জপ করতে লাগলাম। দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করে বসলেন। আমি চারদিক কৃষ্ণময় দেখলাম। আমার কাণে কৃষ্ণ, আমার চোখে কৃষ্ণ, আমার হৃদয়ে কৃষ্ণ আমার চারদিকে কৃষ্ণ।

বলতে বলতে প্রভুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

সভার সন্ন্যাসীদের হৃদয়ের মধ্যে একটা কান্নার সুর বেজে উঠল।

প্রভু বলতে লাগলেন—অবশেষে আমি কখনো হাসি কখনো কাঁদি কখনো নাচি কখনো গান করি। আমার দেহ-মন অবশ হয়ে গেল। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম।

আমি তখন গুরুর শরণাপন্ন হলাম। তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম—প্রভু আমাকে এই কৃষ্ণনাম থেকে পরিত্রাণ কর। দিন-রাত আমার কাণে শুধুই কৃষ্ণনাম ঝংকৃত হচ্ছে, আমি যে আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কণ্ঠ আমার অবিরাম কৃষ্ণনাম বলছে, আমি তাকে রোধ করতো পারি না। কৃষ্ণনাম শুনলে মন আমার নেচে ওঠে, বন্যার মত অশ্রুরাশি নয়ন থেকে উথলে উঠে। মন আমার বিকল, দেহ অস্থির। গুরুদেব আমায় রক্ষা কর, পরিত্রাণ কর।

গুরুদেব আমার সব কথা শুনে বললেন—এ তোমার বিপদ নয়, সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম তুমি লাভ করেছ। সহস্র বৎসর তপস্যা করে যে পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব হয় না তা তুমি কৃষ্ণনাম জপ করেই পেয়েছ।

গুরুর কথা শুনে আমি কৃষ্ণনামকে আরও সুদৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলাম। সেই থেকে আমি যে হাসি গাই নাচি কাঁদি সব ঐ কৃষ্ণনামের শক্তিতে পরিচালিত হয়েই করি। তাতে আমার কোন হাত নেই—আমি ইচ্ছা করে কিছু করি না।

সভাতল স্তব্ধ।

প্রভুর কণ্ঠ-উচ্চারিত মধুর কৃষ্ণনাম শুনে সকলেরই হৃদয় এক অভিনব ভাবে আবিষ্ট হলো।

প্রকাশানন্দ মুগ্ধ, বিগলিতচিত্ত।

কোমল ঝংকারের কোমলতম প্রতিধ্বনি সভাস্থ সকলের হৃদয়ের মধ্যে ঝংকৃত হতে লাগল। একটা সুর একটা উচ্ছ্বাস যেন সভাময় ভেসে বেড়াতে লাগল। যে সুর, যে উচ্ছ্বাস ভঙ্গ করতে সহসা কারও সাহস হলো না।

কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রকাশানন্দ বললেন—শ্রীপাদ আপনি কৃষ্ণনাম করেন তাতে কারও আপত্তি নেই। স্বীকার করি কৃষ্ণনাম অতি দুর্লভ বস্তু কিন্তু আপনি বেদান্ত পড়েন না কেন?

প্রভু বললেন—শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তর না দিলে আমার অপরাধ হবে। আবার সঠিক উত্তর দিলে আপনাদের বিরক্তি জন্মাতে পারে। যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন তাহলে বলতে পারি কেন আমি বেদান্ত পাঠ করি না।

প্রকাশানন্দ বললেন—আপনার আবার অপরাধ! আপনার কথা শুনতে কি কারও বিরক্তি জন্মাতে পারে! অমন আদেশ করবেন না শ্রীপাদ। আপনার বক্তব্য স্বচ্ছন্দে বলুন।

প্রভু বললেন—বেদান্ত ঈশ্বরের বাক্য—কিন্তু শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা শঙ্করেরই রচিত। সূত্র মাথা পেতে নেব কিন্তু ভাষ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নেই।

—কেন?

—বেদান্তের সূত্র সরল ও অর্থময়, কিন্তু ভাষ্য কূট ও কদর্থপুর্ণ।

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন শ্রীপাদ যে শঙ্কর জগৎ গুরু ও সন্ন্যাসী মাত্রেরই নমস্য।

—আমি কিছুই ভুলে যাইনি। যখন বিচার করব, তখন তাঁর কার্যের বিশ্লেষণ করে বিচার করতে হবে তাঁর পরিচয় নিয়ে

বিচার করব না। আরও একটা কথা আমার বিশ্বাস শঙ্কর ইচ্ছা করেই সূত্রের বিকৃত অর্থ করেছেন।

—তাঁর উদ্দেশ্য কি?

প্রভু বললেন—শঙ্কর মায়াবাদী তিনি সোঽহংতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার অভিলাষে বেদান্তের প্রত্যেক সূত্রের একটা মন কল্পিত অর্থ করেছেন। বেদান্তকে এনে তাঁর মতের পোষকতা করতে না পারলে হিন্দু তা গ্রাহ্য করবে না, তাই বিকৃত তিনি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন।

সন্ন্যাসীরা একটু বিরক্ত ও চকিত হলেন। শঙ্করের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকতে পারে তা তাঁরা কখনও শোনেননি—নিজেরাও কখনও ভাবতে পারেননি।

প্রকাশানন্দ বললেন—শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলবার কি হেতু আছে? তাঁর ভাষ্যে যে আপনি দোষারোপ করছেন, এ বড়ই সাহসের কথা।

প্রভু বললেন—আপনার যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি দেখাব সূত্রের অর্থ কত সহজ ও সরল আর ভাষ্য কত দুর্বোধ্য ও কদর্থপূর্ণ।

অতঃপর শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভাষ্যের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলেন।

এক একটি সূত্রের অর্থ শঙ্কর যেমন করেছেন তা বলতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থ খণ্ডন করে যেতে লাগলেন সন্ন্যাসীরা স্তব্ধ হয়ে প্রভুর কথা শুনতে লাগলেন—তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হলেন। প্রকাশানন্দের গর্ব ছিল, পাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। প্রভু আজ তাঁর সে গর্ব চূর্ণ করে দেখালেন তিনি ত কোন ছার শঙ্করাচার্যও ভ্রান্ত ও বিপথগামী।

সন্ন্যাসীদের চোখ ফুটল। তারাও তখন ভাষ্যের দোষ ও কদর্থ দেখতে পেলেন।

প্রকাশানন্দ সদাশয় ও মহাপণ্ডিত—প্রভুর ব্যাখ্যার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে অবনতমস্তকে সমস্ত স্বীকার করে নিলেন।

বললেন —শ্রীপাদ, আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত আমাদের প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। আপনি যে পরম পণ্ডিত তাও জানলাম। গুরু শঙ্করের মত খণ্ডন করে আপনি অসীম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এখন কৃপা করে আবার কিছু শক্তির পরিচয় দিয়ে সূত্রের প্রকৃত অর্থ করুন দেখি আপনি কি বুঝেছেন।

তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু ঝড়ের বেগে প্রতিটি সূত্র মুখস্থ বলে তার প্রকৃত অর্থ বলে যেতে লাগলেন। তাঁর ব্যাখ্যা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি হৃদয় গ্রাহী। তিনি যা অর্থ করলেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো ভগবান ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—ভক্তি আর প্রেম দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় ভগবৎ প্রেম জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।

আগে প্রভু ভাষ্যের দোষ ধরেছিলেন, এখন সূত্রের সরল ব্যাখ্যা করলেন। সকলের এই ব্যাখ্যা সত্য ও প্রকৃত বলে মনে হলো। তা ছাড়া ভক্তির একটা আকর্ষণী শক্তি আছে! মানুষ স্বভাবতঃই ভালবাসতে চায়—ভালবাসার পাত্র খুঁজে বেড়ায়।

সন্ন্যাসীদের জীবন মরুভূমির মতো শুষ্ক হলেও ভেতরে কোমল স্নেহধারা আছে। সেই উৎসের অস্তিত্বও তাঁরা হয়ত অবগত ছিলেন না—এতদিন অভিমান, গর্ব, অন্ধবিশ্বাস, প্রভৃতি নানা আবর্জনা দিয়ে তা আবদ্ধ ছিল।

আজ হঠাৎ সেই উৎসের মুখ থেকে আবর্জনা সরে গেল। স্নেহ-ধারার তাঁদের হৃদয় প্লাবিত হলো। তাঁরা সহসা দেখলেন, তাঁদের ভালবাসার পাত্র আছে, আর সেই পাত্র স্বয়ং প্রেমময় ভগবান—যাঁর তত্ত্ব জানার জন্যেই তাঁরা ওই শুষ্ক, কঠোর জীবন বহন করে বেড়াচ্ছেন।

তখন তাঁরা আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠলেন। সেই সহস্র কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি শঙ্খনিনাদের মতো ভক্তিদেবীকে আবাহণ করল। অভিমান, দ্বেষ, নাস্তিকতা সব দূরে গেল।

তখন প্রকাশানন্দ সকাতরে করোযোড়ে সেই হাজার হাজার দর্শকের

সামনে প্রভুকে বললেন—শ্রীপাদ, এতদিন আমি আপনাকে নিন্দা, দ্বেষ ও ঘৃণা করে এসেছি। তার কারণ, আমি এতকাল দম্ভে আর অভিমানে পূর্ণ ছিলাম। আপনাকে চিনতাম না, আপনার মহিমা বুঝতাম না। আজ আপনারই কৃপায় আপনাকে চিনলাম। বুঝলাম আপনি স্বয়ং বেদ—আপনিই নারায়ণ। ভক্তি যে কি পদার্থ, তা আগে বুঝতাম না, বরং ঘৃণা করতাম। আজ আপনি অশেষ কৃপা করে তা বোঝালেন। আপনি আমার প্রকৃত গুরু। আজ সত্যিই যেন আমার নতুন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। আজ বুঝলাম শ্রীকৃষ্ণ সত্য, তাঁর সেবা আর ভজনাই হচ্ছে জীবের পরম ধর্ম। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোক!

সন্ন্যাসীরা তখন ভক্তি গদ গদ চিত্তে আবার সম্মিলিতভাবে হরিধ্বনি করে উঠলেন।

আকাশ বাতাস যেন সে শব্দে ঝংকৃত হয়ে মধুময় হয়ে উঠল।

তারপর সকলে আহারাদি করে মহানন্দে নিজ নিজ আবাসে ফিরে গেলেন।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সারা কাশীধামের বুকে এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ল।

॥ বাইশ ॥

দুতিন দিন পর।

সেদিন সকালে দেখা গেল কাশীর কোনও এক পথে এক সন্ন্যাসী দ্রুত পায়ে চলেছেন। আর এক সন্ন্যাসী অন্য পথ দিয়ে এসে প্রথম সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হলেন। পরস্পর নমস্কার বিনিময়ের পর প্রথম সন্ন্যাসী দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করলেন—এত জোরে কোথায় চলেছ ভাই ?

—গৌরাঙ্গ প্রভুতে দেখকে পাচ্ছি। আর তুমি ?

—আমিও ত তাই। সকলেই তাই।

—এত সন্ন্যাসী ?

—হ্যাঁ ভাই, দলে দলে চলেছে।

—কেন, আবার তর্ক করবে নাকি ?

—পাগল! আবার তর্ক? সাক্ষাৎ নারায়ণের সঙ্গে তর্ক করে কে কবে জয়লাভ করেছে বলো ত ?

—তবে এখন কি করতে এত লোক চলেছে ? তুমি কেন যাচ্ছ ?

—তাঁর চরণে শরণ নেব, তারপর তিনি যা হয় করবেন !

—গুরুদেবের খবর কি ?

—তাঁর নয়নে এখন অশ্রুধারা। আমি দেখলাম, তিনি এখন পুঁথি বাঁধছেন। বোধ হয় গঙ্গার জলে সব ফেলে দেবেন।

—আমারও তাই ইচ্ছা। প্রভুর সঙ্গে কাশী ছেড়ে নীলাচলে যাই।

—দেখেছ. কত লোক প্রভুর বাড়ির দিকে চলেছে ?

—আর সকলের মুখেই কৃষ্ণনাম। একদিন এই বারাণসীতে শুধু হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনি উঠত—আর আজ হরিধ্বনিতে সারা নগরী প্রতিধ্বনিত। এমন ত আর কখনো শুনিনি।

—অবতারও বোধ হয় আর কখনো দেখিনি।

—কিন্তু এত ভিড়ের মধ্য দিয়ে ত আর এগুনো যাচ্ছে না!

—একি, প্রভুর বাড়ি থেকে সব লোক ফিরে আসছে কেন?

—একজনকে জিজ্ঞাসা কর না।

বলে একজন পথিককে ডেকে প্রশ্ন করল—ও ভাই, তোমরা সব ফিরে যাচ্ছ কেন?

—প্রভু যে এখানে নেই।

—কোথায় তিনি?

—বিন্দুমাধবের মন্দিরে গেছেন।

—চল, আমরাও সেখানে যাই।

সকলে চলতে লাগল বিন্দুমাধবের মন্দিরের দিকে।

প্রভু রোজ সকালে সনাতন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তদের নিয়ে পঞ্চনদে স্নান করতে আসেন। ঐ পথেই তাঁরা বিন্দুমাধবের মন্দিরে যান—বিন্দুমাধব দর্শন করে তারপর ঘরে ফেরেন।

বিগ্রহ দর্শন করবার সময় প্রভুর ভাবোদয় হত। কিন্তু তিনি এতদিন সে ভাব সংবরণ করে নিতেন।

কিন্তু আজ তিনি তা পারলেন না। বিন্দুমাধবকে আজ দর্শন করা মাত্রই যেন তাঁর প্রেমসিন্ধু উথলে উঠল। তিনি আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন!

ভক্তেরাও তাঁর সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করলেন। হাতে তালি দিয়ে তাঁরা গাইতে লাগলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হাজার হাজার লোক জমে গেল।

জলস্রোতের মত চারিদিক থেকে লোক ছুটে এসে প্রভুর সে নৃত্য দেখতে লাগল। যারা পেছনে পড়ল, তারা নৃত্য দেখতে পেল না—দেখল শুধু প্রভুর প্রেমবিহ্বল বদলকমল আর তাঁর নয়নের অবিরল বারিধারা। যারা প্রভুর কাছে, তারা নিস্তব্ধ, নির্বাক—আর যারা দূরে তারা নানা কথা বলছে।

একজন বলল ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। আহা, আমি একবার ভাল করে দেখতে পেলুম না।

দ্বিতীয় জন বলল—তুই কেমন করে জানলি যে ইনিই শ্রীকৃষ্ণ?

—সন্ন্যাসীরা তাই বলছেন।

—তুই বোকা, তাই ওসব কথা বিশ্বাস করিস।

—আমি যেন ভগবানে বিশ্বাস করে চিরদিন বোকাই থাকি ভাই।

—আচ্ছা বল্ ত শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং কেমন?

—কালো।

—আর একে দেখ ত!

—ইনি সোনার বরণ।

—তবে?

—ভগবান কি কাউকে লেখাপড়া করে দিয়েছেন যে বার বার একই রকম রং নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন?

এমনি নানা কথা চলতে থাকে।

যারা প্রভুর কাছে, তারা ভাবছিল, যদি একবার প্রভুর এই কমলনয়নের বারিধারায় স্নান করতে পেতাম ত ধন্য হতাম। আমার মানব জন্ম সফল হত।

আর একজন বলল—আমি যদি ওই নয়নের এক ফোঁটা জলও পেতাম, তাহলেই আমার জন্ম জন্মান্তরের পাপ ধুয়ে মুছে যেতো। কৃষ্ণপ্রেম যেন জল হয়ে ওঁর নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে।

আর একজন বলল—ফোঁটার দরকার নেই, সামান্য একবিন্দু পেলেই সব তীর্থের জল পাওয়া গেল।

—আমি যদি একবার প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে পাই, তা হলে আর কিছু চাই না।

—আরে বাবা, তোর স্পর্ধা ত কম নয়!

—কেন?

—স্পর্শ? বলি, কত পুণ্যি করেছিলি, তাই ত দর্শন পেলি। আবার বলে কিনা স্পর্শ! আমরাই বলে সাহস করছি না।

—কেন? তুমি কি এমন মহা পুণ্যবান শুনি?

—আমি ঠাকুর দেবতা দেখতে পেলেই প্রণাম করি। সকালবেলা দুর্গা দুর্গা শিব শিব না বলে বিছানা ছাড়ি না, প্রত্যেক পার্বণে গঙ্গাস্নান করি, কাণা খোঁড়া দেখলে পয়সা দিই—আমার চেয়ে পুণ্যিবান কটা এখানে আছে শুনি?

লোকটি এগিয়ে গেল।

আগের লোকটি বিড় বিড় করে বলল—সুযোগ পেলেই লোককে ঠকাবে, আর এখন লম্বা লম্বা পুণ্যের ফিরিস্তি শোনাতে বের হয়েছে! আরে ছি, এ সব জায়গায় ভদ্রলোক থাকে!

ওধারে এক জায়গার অন্য দুজন লোকের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

একজন বলল—আমি একটা মতলব বের করেছি ভাই।

—কি রকম?

—প্রভু যেখানে নাচছেন ওখানকার মাটি খানিকটা তুলে এনে রাখব। তারপর রোজ একটু একটু করে পরিবারের সকলে খাব বাকীটা ছেলেদের জন্যে রেখে যাব—তারা পুরুষানুক্রমে পর পর খাবে।

—আমি ভাই অন্য কথা ভাবছি।

—কি?

এই মাটি নিয়ে কিছু কিছু মোড়কে মুড়ে ভাল দামে বিক্রী করা যাবে। যখন প্রভু এখানে থাকবে না তখন তাঁর চরণ রজ ভাল দামে বিক্রী হবে।

—সব জায়গাতেই ব্যবসা! চুপ কর—ওই দেখ প্রকাশানন্দ এসেছেন।

দুজনেই কথা বন্ধ করে সামনের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

সত্যিই প্রকাশানন্দ এসেছেন।

জনতা সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে এসে প্রভুর কাছে দাঁড়ালেন।

তাঁর আর সে বেশভূষা নেই—দণ্ড কমণ্ডলু নেই, জটার বাঁধন নেই, অঙ্গে ভস্ম নেই।

হারানো ছেলের সন্ধান পেলে তার মা যেমন আলু থালু বেশেই তাকে দেখতে ছুটে আসেন প্রভুর নৃত্য-গীতের সংবাদ পেয়ে সরস্বতী তেমনি ভাবেই ছুটে এসেছেন। অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে প্রভুর অপূর্ব নৃত্য তিনি নিস্পন্দ নয়নে দর্শন করতে লাগলেন।

দেখলেন সুবর্ণ দণ্ডের মত সমুজ্জ্বল দুটি হাত তুলে এক দীর্ঘকায় জ্যোতির্ময় পুরুষ ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন।

মুখে তাঁর অবিরল কৃষ্ণনাম—নয়নে বারিধারা অংগে পদ্মগন্ধ।

তাঁর যে প্রেমার্দ্র বদনচন্দ্র দেখে সরস্বতী বিমোহিত হলেন।

হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁর মূর্তি তিনি এ কয়দিন নিরন্তর ধ্যান করছিলেন, আজ সে মূর্তিকে সর্বমাধুর্য মণ্ডিত দেখে তাঁর অন্তর গৌরাঙ্গময় হয়ে উঠল। তিনি ভেতরে বাইরে শুধু গৌরাঙ্গ দর্শন করতে লাগলেন।

প্রকাশানন্দের যে নয়ন কখনও অশ্রুসিক্ত হয়নি আজ সে চোখ অশ্রুর বেগ ধরে রাখতে পারল না। যে চরণ কখনও পরের কথায় ওঠেনি—আজ সে চরণ প্রভুর নৃত্য দেখে আপনি নেচে উঠল। যে হৃদয় ছিল কঠোর ও শুষ্ক সে হৃদয় আজ হলো কেমন যেন কোমলতা মাখান—স্নেহাপ্লুত।

সম্পূর্ণ নতুন এক ভাবধারায় যেন তাঁর অন্তরের অন্তস্থল অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠল।

অন্ধকার সরোবরের অতলস্পর্শী তমসার ভেতরে যেন মিলে গেল নতুন এক মায়াপুরীর সন্ধান।

প্রভু তখন নৃত্যের তালে তালে গাইছিলেন—

ভজ শ্রীকৃষ্ণ কহ শ্রীকৃষ্ণ লহ শ্রীকৃষ্ণের নাম রে,
যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

তাঁর সেই তালে তাল মিলিয়ে প্রকাশানন্দের অন্তর গেয়ে উঠল—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

যে অসীম অব্যক্ত আনন্দ শিহরণের আশায়, মায়ার গণ্ডিতে আবদ্ধ জীব যুগে যুগে ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ হয়েছে, যে সচ্চিদানন্দের স্পর্শে সব দুঃখ সব গ্লানি সব কষ্ট নিমেষে দূর হয় সেই অনস্বাদিত আনন্দের তরঙ্গ যেন আজ প্রকাশানন্দের হৃদয়ে ঝংকার তুলল।

একটা অপরিসীম কান্নার আবেগ যেন তাঁকে বেষ্টন করে করল। প্রকাশানন্দ নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারলেন না। কিছুতেই তিনি আজ এই মহামূল্য মুহূর্তটিকে হেলায় নষ্ট করলেন না। প্রেমের অশ্রু তাঁর দুচোখ দিয়ে অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ে তাঁর বক্ষকে সিক্ত করল।

বহু লোকের কলরবে অবশেষে প্রভুর সমাধিভঙ্গ হল। তিনি নৃত্য সংবরণ করলেন। দেখলেন, প্রকাশানন্দ তাঁর সম্মুখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান।

প্রকাশানন্দ ছুটে গিয়ে প্রভুর চরণের ওপর পড়লেন। প্রভু তাঁকে সাদরে হাত ধরে উঠালেন।

সরস্বতী কাতরে করযোড়ে বললেন—প্রভু আমায় কৃপা কর —আমি তোমার কাছে অপরাধী।

প্রভু বললেন—আমার কাছে তোমার কোন অপরাধ নেই সরস্বতী।

—যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করে থাক প্রভু, তবে আমায় সেবক করে তোমার সঙ্গে লও।

—তোমার স্থান বৃন্দাবনে, আমার সঙ্গে নয়।

—জীবের পদে পদে বিপদ। এ সময় তুমি আমাকে চরণে স্থান না দিলে আমি আবার ডুবে মরব।

—তোমার আর বিপদ নেই। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন।

—প্রভু তোমার বিরহ যে আমি সহ্য করতে পারব না।

—বৃন্দাবনে তুমি আমার দর্শন পাবে।

—তুমি ত আমায় বৃথা প্রবোধ দিচ্ছ না?

—না। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করবে তখনই আমার দর্শন পাবে। তুমি নিশ্চিন্তমনে বৃন্দাবনে যাও।

—আপনার প্রবোধে আমি বড় আনন্দ পেলাম।

—তোমার এই আনন্দ দিন দিনই বর্ধিত হবে। আজ থেকে তোমার নাম হলো প্রবোধানন্দ।

প্রবোধানন্দ প্রভুর চরণ ধূলি নিয়ে বিদায় নিলেন। প্রভুও পরদিন নীলাচলের পথ ধরলেন। সনাতন সঙ্গে যেতে চাইলেন প্রভু বারণ করলেন। বললেন—তুমি এখন বৃন্দাবনে যাও, সময়ে নীলাচলে এসো। রূপ আর অনুপ বৃন্দাবনে গেছে, লোকনাথ ভুগর্ভ সেখানে আছেন।

সনাতন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

প্রভু যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই চললেন নীলাচলের দিকে।

॥ তেইশ ॥

সনাতন এলেন বৃন্দাবনে।

কিন্তু বৃন্দাবনে রূপ বা অনুপ কেউ নেই। বৃন্দাবনের সে অন্য রূপ—তীর্থ নেই, মন্দির নেই, বিগ্রহ নেই, বৈষ্ণব সমাজ নেই। দু পাঁচ জন ছাড়া বড় ভক্ত বা সাধক বিশেষ নেই—চারদিকে শুধু ঘোর জঙ্গল।

এই কি সেই বৃন্দাবন যেখানে একদিন বৈকুণ্ঠনাথ লীলা করেছিলেন? বিচরণ করত শ্যামলী ধবলী। নেচে নেচে গান করত গোপ বালকেরা। যমুনাতীরের আঁকা বাঁকা সুদীর্ঘ পথ বেয়ে বেয়ে বাঁশি বাজিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলতেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এখানেই কি ঘটেছিল সেই সব মোহনলীলা—পুতনা বধ, বকাসুর বধ, গোবর্ধন ধারণ, কালীয় দমন?

এ বৃন্দাবনে সনাতনের মন বসল না। প্রভুর দিকে মন ছুটল। কিছুদিন বৃন্দাবনে থেকেই সনাতন ছুটলেন নীলাচলে প্রভুর কাছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব যে পথে এসেছিলেন সনাতন সেই পথ ধরে চললেন নীলাচলের পথে। পদব্রজে দ্রুত এগিয়ে চললেন। বারণসী ত্যাগ করে ঝাড় খণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করলেন।

জঙ্গল বড় নিবিড়। দৃশ্য বড়ো সুন্দর—বড় নয়নাভিরাম।

বৃক্ষ বৃক্ষের অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়েছে। লতা বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরেছে। গাছে ফল, লতায় ফুল। বৃক্ষে অসংখ্য পাখি। লতার গায়ে অগণিত মৌমাছি, প্রজাপতি।

পাখি ডাকছে, ভ্রমরেরা গুণ গুণ করে যেন শ্রীহরির গুণগান করছে। আবার মাঝে মাঝে বন্য জন্তুও আছে। তাদের ক্রুদ্ধ হুংকার ভেসে আসছে।

সনাতন ভাবলেন।

সংসারে মানুষও ত তাই করছে। মানুষের হিংস্র ক্রুরতা নাস্তিকতা হৃদয়হীনতা বুঝি বন্য জন্তুর হিংস্রতাকেও হার মানায়।

কিন্তু বনে লতা ঝরনা বৃক্ষ শাখায় পাখির কাকলি—এসব স্নিগ্ধতার পরশ সংসারে কতটুকু মেলে? তাই বুঝি অরণ্যই সাধকের কাছে কাম্য।

সনাতন নির্ভয়ে চলেছেন।

মুখে হরিনাম, হাতে দণ্ড।

তিনি গাইছেন—

কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ, কেশব রক্ষা মাং…

এই গান গাইতে গাইতে প্রভু পথ চলেন—তাই সনাতন এই নামই ধরেছেন। নাম গানের এমনি শক্তি যে ভয় বা চিন্তা কিছুই থাকে না। সনাতন তাই নির্ভয়ে চলেছেন।

সহসা নিবিড়তর জঙ্গলে তাঁর পথ রুদ্ধ হলো। সনাতন দাঁড়ালেন। ভাবলেন, এ পথে কেন গাছে ফুল নেই, লতায় পুষ্প নেই, পাখির গান নেই? তবে কি প্রভু এ পথে আসেন নি?

কেন তিনি তবে এ পথে এলেন?

সনাতন ফিরলেন। বৃক্ষশাখার পানে তাকিয়ে পথ নির্ণয় করলেন। এই যে, এই পথে প্রভু গেছেন—দুধারে তৃণ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অংগের পদ্মগন্ধ পেয়ে আজও ভ্রমরকুল আকুল হয় ছুটোছুটি করছে।

এ পথে গাছে গাছে ফল, লতায় লতায় ফুল।

একটি সুন্দর সুগন্ধি ফুলের গায়ে হাত বুলিয়ে সনাতন জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এ রূপ, এ গন্ধ, কোথায় পেলে ফুল? তুমি যাঁর

ইচ্ছায় আমারই মত ধরাধামে এসেছ, তুমি কি তাঁকে দেখেছ? সেই পরম সুন্দরকে দেখে তুমি কি তোমার জন্ম সার্থক করেছ? তুমি ত নিজের জন্যে আসনি, তাঁরই জন্যে এসেছ—তবে কেন তাঁর চরণে পড়ে এ জন্ম সার্থক করলে না?

সনাতন চলতে লাগলেন। বিরাট হস্তীযূথ দেখা গেল। সনাতন পরম নির্ভয়ে তাদের সমীপবর্তী হলেন। বললেন—কাকে তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছ? কে তিনি? সেই বনবিহারী, যিনি বনের রাজা, পৃথিবীর রাজা, তোমার আমার সকলের রাজা। সেই রাজার রাজাকেই বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছ? তাঁকে একবার দেখে বুঝি আমারই মত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বিশ্বময় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছো?

তিনি বড় দয়াল—একান্তভাবে তাঁকে যে খোঁজে সেই তাঁর দর্শন পায়। খোঁজ খোঁজ—বনময় তন্ন তন্ন করে খোঁজ। খুঁজলেই দর্শন পাবে। এই বনের ভেতরেই আবার তিনি এসে দর্শন দেবেন।

হস্তীযূথ চলে গেল। খিদে পেলে গাছের ফল আর ঝরনার জল খেয়ে আবার পথ চলেন।

সূর্যাস্তের আগেই বনের ভেতরে অন্ধকার নেমে এলো। সনাতন এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হলো। এত গাঢ়, এত নিবিড় যে, সনাতন নিজেই নিজের অঙ্গ প্রতঙ্গ দেখতে পেলেন না।

কিন্তু তিনি নির্ভয়। হৃদয় আলো করে বসে আছেন প্রভু। আলোয় যা দেখা যায় তাতো অস্থায়ী মিথ্যা—কিন্তু অন্ধকারে যা দেখা যায় তা শাশ্বত, ভাস্বর, ধ্রুব। আনন্দ উথলে ওঠে। সনাতন গান ধরলেন—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব সখা চ বন্ধু ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।

প্রভাতে উঠে সনাতন আবার পথ চলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ধোঁয়ার রেখা দেখে বুঝলেন কাছেই গ্রাম।

হঠাৎ পথের পাশ থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুর তক্রপান করবে ?

সনাতন দেখলেন, একটি লোক এক কলসী তক্র নিয়ে পথের পাশে বসে আছে। বুঝলেন, লোকটি গয়লা, দধি দুগ্ধ বিক্রী তার ব্যবসা। বললেন আমি ভিখারী মানুষ এর মূল্য কোথায় পাব ?

গোপ বলল—আমি মূল্য চাই না ঠাকুর, আমার ঘোলটুকু খেয়ে আমায় কৃতার্থ কর।

—তুমি কি রোজ ঘোল নিয়ে আস ?

—হ্যাঁ, রোজ আসি। যে দিন পথিক পাই, পথিককে দিই—যেদিন না পাই, এইখানে ঢেলে দিই।

—তুমি মূল্য নাও না কেন ?

মূল্য একজন আমায় দিয়ে গেছেন অনেক দিয়ে গেছেন—যুগ যুগ ধরে তক্র পান করালে বোধ হয় সে ঋণ শোধ হবে না।

—কে তিনি ?

—কে, তা ত জানি না। জানি শুধু তিনি আমার পিতা, আমার প্রভূ, আমার বুক আলো করা ধন।

—কোথায় তাঁকে দেখলে ?

—ওই খানে—যেখানে আমি ঘোল ঢালি ওই খানে, সরে দাঁড়াও ঠাকুর, এখানে পা দিও না। ওইখানে দাঁড়িয়ে আমায় প্রভু একদিন মধ্যাহ্নে আমার কাছে তক্র চাইলেন। বললেন—তিনি তৃষ্ণার্ত। আমি কলস ধরে দিলাম, দুহাতে তিনি কলস তুলে সবটুকু পান করলেন। আমি মূর্খ পাষণ্ড—তাঁর কাছে মূল্য চাইলাম। তিনি বললেন—মূল্য নিয়ে কি করবে ? আমি বললাম আমার মা স্ত্রীকে পালন করতে হবে। তিনি তখন বললেন

পেছনে যে দুজন আসছেন তাঁরা মূল্য দেবেন। বলে তিনি চলে গেলেন।

বলতে বলতে গোপের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। সনাতন বুঝলেন এ বুক আলো করা ধন কে!

গোপ বলল—দেখলাম পেছনে দুজন আসছেন। তাঁরা এলে মূল্য চাইলাম। তাঁরা হেসে বললেন যিনি তক্র পান করেছেন তিনি ভিখারী সন্ন্যাসী আমরা সেই ভিখারীর দাসানুদাস। আমরা অর্থ কোথায় পাব! তবে প্রভু যখন তোমার ঘোল পান করেছেন, তুমি ধন্য, তোমার বংশ ধন্য।

তাঁদের কথা শুনে হতাশ হয়ে গৃহে ফিরতে উদ্যত হলাম। কিন্তু কলসী ওঠাতে গিয়ে দেখি সেটি অত্যন্ত ভারী—ভেতরে চেয়ে দেখি সেটি স্বর্ণে পরিপূর্ণ।

গোপ নীরব হলো।

দুজনে ধ্যানে দেখছিলেন প্রভু যেন তাঁদেরই সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনছেন।

সনাতন জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর?

গোপ বলল—তার পর আমি প্রভুর পেছনে ছুটলাম। আমাকে দেখে তিনি হেসে উঠলেন। আমি তাঁর চরণে আশ্রয় চাইলাম। প্রভু বললেন—আমার বরে তুমি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করবে। সময় হলে তোমায় ডেকে নেব—এখন সংসার করগে।

গোপের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। সনাতন জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি তবে তার থেকে এখানে প্রত্যহ ঘোল নিয়ে আস?

গোপ মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

সনাতন বললেন—আমিও তোমার সেই প্রভুর দাসানুদাস, তাঁরই চরণ দর্শনের আশায় চলেছি।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—নীলাচলে এখন রয়েছেন। তবে সর্বকালে সর্বজীবহৃদয়ে তিদি বিরাজমান। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

—না।

—কেন ?

—তিনি বলেছেন এখন সংসার করতে। যখন সময় হবে, তখন তিনি ডাকবেন। আচ্ছা ঠাকুর বলতে পার তিনি কে ?

—তিনি স্বয়ং ভগবান।

—না না, তত বড় নাম বলো না শুনলে ভয় হয়। আমি যে মহাপাপী—ব্যবসা করতে গিয়ে কত লোককে ঠকিয়েছি কত মিথ্যা কথা বলেছি। আমি ভগবানের সামনে কেমন করে যাব ?

—ভগবান দয়াময়, দণ্ডদাতা নন। দণ্ড দেয় আমাদের কর্ম, তাঁকে ডাকলে তিনি আমাদের কর্মক্ষম করে দেন—অশ্রু দেখলে বুকে করে নিয়ে সান্ত্বনা দেন। তিনি আমাদের পিতা—তাঁকে ভয় কি ?

—তোমার ভগবান তোমার থাকুন আমি তাঁকে চাই না। আমি চাই আমার সেই সোনার বরণ মদনমোহনকে। আহা কি করুণাময় দৃষ্টি কি মধুর হাসি, কি মিষ্ট কথা, কত দয়া !

সনাতন তক্র পান করে প্রস্থান করলেন। পথ চলতে চলতে আবার পথ হারিয়ে ফেললেন।

চারদিকে নিবিড় জঙ্গল। সন্ধ্যার খুব বেশি দেরী নেই। অন্ধকারে পথ হারিয়ে সনাতন এক গাছের নিচে বসলেন।

ভাবছেন কোন পথে তিনি যাবেন।

হঠাৎ কোন অজানা গায়কের কণ্ঠ এসে কাণে বাজল। তিনি মধুর অথচ কাতর কণ্ঠে ভজন গাইছেন—কি ব্যাকুলতা মাদকতা সে কণ্ঠে মেশানো।

সনাতন চীৎকার করে উঠলেন—হে উন্মাদ, হে মহাপুরুষ দেখা দাও, বিভ্রান্ত করো না।

কোথায় কে? কোন শব্দ নেই, সব নিস্তব্ধ। উঠে চারদিকে চেয়ে সনাতন তাঁর দেখা পেলেন না। মনে হলো এ কণ্ঠ তিনি যেন কোথায় শুনেছেন।

বৃক্ষকাণ্ডের ওপর শুয়ে তিনি রাত কাটালেন।

পরদিন প্রত্যুষে তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর অঙ্গময় গলিত কুষ্ঠ—কিন্তু কেন যে হঠাৎ সারা অংগে এই কঠিন ব্যাধি হল তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

॥ চব্বিশ ॥

এদিকে সপ্তগ্রামে রঘুনাথকে নিয়ে তাঁর বাবা আর জ্যেঠা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

রঘুনাথ শুধু উদভ্রান্তচিত্তে ঘুরে বেড়ান—বিষয়াদি দেখেন না তবে পিতার ঠিক যে অবাধ্য এমন নয়। শুধু তিনি বিষয় সম্পত্তির প্রতি একান্তভাবে উদাসীন।

ভ্রমণে শয়নে সব সময়ে রঘুনাথ নজরবন্দী। আহা বংশের একটি মাত্র ছেলে সে পাগল হয়ে গেল! তার পিতা খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

একদিন সকালে এই নিয়ে দুই ভাই হিরণ্য আর গোবর্ধনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। দুজনেই রঘুনাথকে প্রাণের থেকে ভালবাসেন—কারণ রঘুনাথ সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী—বংশের মধ্যে একমাত্র সন্তান।

হিরণ্য বললেন—কি করা যায় বল ত ভাই, ছেলেটিকে নিয়ে ত আর পারা যায় না।

গোবর্ধন বললেন—বিয়ে দিয়ে অত সুন্দরী বৌ ঘরে আনলাম অথচ সংসারের প্রতিই শুধু নয় স্ত্রীর প্রতি উদাসীন।

—বৌটা রোজ রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—ওর পেটেও যদি একটা কিছু হতো তা হলে আর ভাবনা থাকতো না কিন্তু আমাদের এমনি ভাগ্য ওরও কিছু হচ্ছে না।

হুজনে কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করল।

তারপর গোবর্ধন বলল—আর দেখ দাদা ও যদি শোনে যে রাজ্যের মন্ত্রীরা পর্যন্ত বিবাগী হয়ে চলে গেছেন তা হলে ওকে ধরে রাখতে পারব না।

—আজ একটা বছর আমরা খবরটা লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু যদি দৈবাৎ শুনতে পায় যে রূপ সনাতন সংসার ত্যাগ করছেন তা হলে…

দুজনে এইভাবে কথা চলছিল এমন সময় স্বয়ং রঘুনাথ ধীর পায়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

দুটি চোখ ভাবে ঢুলুঢুলু। যেন বহুদূরে কি দেখছেন। যেন আকাশে কি কথা শুনছেন।

রঘুনাথ এসবে বারাকে দেখে বললেন—বাবা তোমরা আমার শক্র না মিত্র ?

গোবর্ধন বললেন—ছি ছি একথা কেন ? আমাদের মত তোমার হিতাকাঙ্খী আর কে আছে বাবা ?

—তবে কেন জোর করে আমায় ধরে রেখেছ ?

—সে তোমার ভালর জন্যেই।

—আমি দিনরাত অতি দুঃখে কেঁদে কেঁদে বেড়াব এই কি আমার ভাল ?

—এ রাজ সম্পদের মধ্যেও কি তোমার দুঃখ ?

রঘুনাথ একটু হেসে বললেন—গৌড়ের রাজা মন্ত্রীও ত ঠিক রাজ সম্পদের মধ্যেই ছিলেন বাবা !

দুজনে চম্‌কে উঠলেন। সর্বনাশ, তা হলে রূপ সনাতনের কথা রঘুনাথ শুনেছে।

তাঁদের নিরুত্তর দেখে রঘুনাথ বললেন—বল বাবা রূপ সনাতন, নরহরি, গদাধর, লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপাল ভট্ট তাঁদের সবার মাথাই কি বিকৃত হয়েছে ? কি সুখের জন্যে তাঁরা সব ছেড়েছেন ?

সে তুলনায় রাজার ঐশ্বর্য আত্মীয় স্বজন কিছুই নয় বাবা। কেন এমন ভুল বুঝছেন ?

—আমরা ভুল বুঝিনি তুমিই ভুল বুঝেছ।

—আচ্ছা বাবা, একবার প্রাণ খুলে কৃষ্ণ বলে ডাক না।

—আমরা কি ডাকি না, যে তুই ধর্ম-শিক্ষে দিবি ?

—না, সে ডাক নয় বাবা, ঝুলিতে মালা আর বিষয়ে মন রেখে ডাকা নয়। মন-প্রাণ খুলে ডাকা। দেখবে সারা পৃথিবী কি অপরূপ রূপ রসে ভরে তোমার চোখের সাম্‌নে মধুময় হয়ে ফুটে উঠবে।

এমন সময় হিরণ্য বাধা দিলেন। বললেন—না গোবর্ধন, ডেকো না। আমি দেখেছি, ডাকলে কি হয়—রঘুনাথ ও নাম করতে করতে মাতালের মত ধূলোয় লুটিয়ে কাঁদে।

গোবর্ধন বললেন—ডাকব না ?

—না না, কখনো না। কাজ কি ওসব ঝঞ্ঝাটে ?

রঘুনাথ বললেন—চুপ কর—ওই শোন—আকাশে একটা গান বেজে উঠেছে। গান ত নয় বংশীধ্বনি—সারা দিক দিগন্ত যেন সুরে গানে মধুময় হয়ে উঠেছে। দিক তট্ আচ্ছন্ন করে সে সুর-লহরী ভেসে আসছে। প্রত্যেক রক্তবিন্দু পর্যন্ত যেন সে সুরে ধ্বনিত হচ্ছে। আহা, সুরের কি রূপ আছে ? এ যে অতি মোহন রূপ—রূপে আমার হৃদয় ভরে গেল—বিশ্ব-সংসার সে রূপে যেন আলোকিত হয়ে উঠল।

রঘুনাথ বিহ্বলচিত্তে বসে পড়লেন।

গোবর্ধন বললেন—জল, জল, বলে চীৎকার করে উঠলেন।

হিরণ্য বললেন—উঁহুঁ, জলে কিছু হবে না, রঘু রূপ চায়। রূপ এখন পাই কোথায় ? বউমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে শীগ্‌গির নিয়ে এসো। চল, আমরা আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

ব্যবস্থাটা গোবর্ধনের পছন্দ না হলেও তাঁকে সম্মত হতে হলো। রত্নালঙ্কার ভূষিতা হয়ে বধূ ইল্ললা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

রঘুনাথ তা লক্ষ্য করলেন না। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন—আহা, কি রূপ!

ইল্ললা স্বামীর সামনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—কার রূপ দেখে তুমি অমন ক্ষেপে উঠেছো গো?

রঘুনাথ চমকে উঠলেন—কে তুমি? তুমি কি সেই রূপময়? না না, তুমি অতি কুৎসিত। সরে যাও, আমি তোমায় চাইনে—

ইল্ললা বললেন—বুঝেছি, তুমি আমাকে চাও না—আমি ঠাকুরকে কতবার বলেছি, তোমার আর একটা বিয়ে দিন, তা তিনি শোনেন না—

—আমার বিয়ে? কেন ইল্ললা?

—তা হলে তোমার সেই উপপত্নী ঘরে আসবে?

—উপপত্নী?

—তোমার সেই রূপ গো—যার রূপে তুমি পাগল।

—কই তিনি ত নারী নন, তিনিই যে সারা বিশ্বে একমাত্র পুরুষ যাক্‌গে, ও সব কথা তুমি আর বলো না ইল্ললা।

—তা বলব কেন—তুমি যা খুশী করে বেড়াও। পেতাম যদি একবার তোমার সেই রূপকে ত ঝাঁটাপেটা করে ছাড়তুম।

—পাপিষ্ঠা। না অভিমান আর করব না, প্রভু, এ অবোধকে ক্ষমা করো।

ইল্ললা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

আর রঘুনাথ ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে জ্ঞান হারালেন

হঠাৎ রঘুনাথ ক্ষিপ্তের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গোবর্ধন তাঁর পথ রোধ করলেন। বললেন—কোথা যাও রঘু?

রঘুনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—সরে যাও, পথ ছেড়ে দাও

—স্থির হও বাবা, বসো। চঞ্চল হয়ো না।

—আর স্থির থাকতে পড়ছি না বাবা, ওই দেখ আকাশের গায়ে প্রভুর সোনার হাত ফুটে উঠেছে। চেয়ে দেখ, কি সুন্দর। অসীম নীলের সাগর মন্থন করে কি রূপময় জ্যোতি!

গোবর্ধন বললেন—কি আশ্চর্য, এ কি হলো?

হিরণ্য বললেন—বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে, বদ্যি ডাকতে পাঠাও।

—এবারে আমি চলি?

—কোথায় যাবে বাবা? দাঁড়াও।

—কি, প্রভু আমায় ডাকছেন, যেতে দেবে না? আমায় বন্ধ করে রাখবে? এই কি বাপের কাজ? তোমাদের কি সাধ্য আমায় বন্দী কর? সারা বিশ্বের সাধ্য কি স্বয়ং প্রভু যাকে ডাকছেন তাকে আটকে রাখে। দাঁড়াও দয়াল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

বলতে বলতে রঘুনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

হিরণ্য আর গোবর্ধন দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

চারদিকে প্রহরী বসল। রঘুনাথ বন্দী হলেন।

গভীর রাত্রি—রঘুনাথ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ।

ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো।

রঘুনাথ চোখ মেলে চাইলেন। সব দেখলেন—তারপর একান্ত কাতরকণ্ঠে প্রভুকে ডাকতে লাগলেন।

হঠাৎ বাতায়নে শোনা গেল কণ্ঠস্বর। কে যেন ডাক দিল—রঘুনাথ!

রঘুনাথ চমকে উঠলেন।

আবার ডাক শোনা গেল—রঘুনাথ এদিকে এসো।

রঘুনাথ উঠে বাতায়নের কাছে এসে বললেন—কে আপনি?

রঘুনাথ দেখলেন বাইরে বাগানের ধারে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আগন্তুক বললেন—বাইরে এসো রঘুনাথ।

—কে তুমি ?

—সে পরিচয়ে প্রয়োজন নেই।

—কোথায় আমায় নিয়ে যেতে চাও ?

—নীলাচলে—তোমার প্রভুর কাছে।

—তবে চল, এক্ষুণি চল।

আগন্তুক বললেন—আমি জানালা দিয়ে একটি দড়ি ফেলে দিয়েছি—তুমি দড়ি ধরে উঠে এসো।

রঘুনাথ সে পথে ঘর থেকে বের হলেন।

গভীর অন্ধকার।

আগন্তুক তাকে পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন।

রাজবাড়ির উদ্যান পার হয়ে বিশাল উচ্চ প্রাচীরের নিচে এসে রঘুনাথ থামলেন। উদ্যানে প্রাচীর বেষ্টিত— প্রাচীর দ্বারে প্রহরী। আগন্তুক দ্বারের দিকে অগ্রসর না হয়ে এক নিভৃত স্থানে এসে দাঁড়ালেন এবং অল্প আয়াসে প্রাচীরের মাথায় উঠলেন। রঘুনাথ তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হলেন।

প্রাচীরের মাথায় দড়ির তৈরী মই লাগান ছিল—তা ধরে ধরে উপরে উঠলেন রঘুনাথ। তারপর অন্য দিকে নামলেন।

রঘুনাথ এখন মুক্ত।

দ্রুত পায়ে নগর অতিক্রম করে দুজনে বনপথ ধরলেন। অপরিচিত ব্যক্তি আগে আগে চললেন—পেছনে রঘুনাথ।

বনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অপরিচিত ব্যক্তি অতি দ্রুত নির্ভীক পায়ে এগিয়ে চলেছেন। এত দ্রুত তিনি চললেন যে রঘুনাথকে অনেক সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হলো।

যখন ভোর হলো অপরিচিত লোকটি বললেন—রঘুনাথ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।

রঘুনাথ বসলেন। অপরিচিত ব্যক্তির মুখ কেশভারে আচ্ছন্ন

তাঁর বয়স বোঝা যায় না। তিনি বললেন—আমি তাহলে যাই রঘুনাথ। সোজা এই পথ ধরে গেলে তুমি নীলাচলে পৌঁছবে। পথ হারালে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো।

বলে ধীরে ধীরে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

॥ পঁচিশ ॥

সনাতনের সারা অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ—ক্লেদ নির্গত হচ্ছে।

অবশ্য সনাতন তার জন্যে দুঃখিত নন। তাঁর বিশ্বাস প্রভুর ইচ্ছে, ছাড়া বিশ্বে কিছুই ঘটতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাতেই আজ এই ঘৃণ্য রোগ। আশীর্বাদ স্বরূপ এই দারুন ব্যাধি সনাতন মাথা পেতে নিলেন।

সনাতন নীলাচলে এসে হরিদাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করলেন।

সনাতনের জাতি নেই—তিনি মুসলমানের নিমক খেয়ে হিন্দুর জাত মেরেছেন, দেবমন্দির ভেঙেছেন, হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করবে কেন ?

সনাতন নিজেকে মানব মাত্রেরই অস্পৃশ্য বিবেচনা করে সদাশয় প্রেমিক হরিদাসের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

হরিদাসের তখন অনেক বয়স। তিনি প্রভুর চেয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের বড়। নিত্যানন্দের চেয়ে বাইশ তেইশ বছরের বড়। তবে তাঁর গুরু অদ্বৈতাচার্যের চেয়ে সতর বছরের ছোট। বয়সের সঙ্গে তাঁর দেহ কিছু স্থূল হয়ে পড়েছে। তিনি চিরদিনই কিঞ্চিৎ স্থূল—তবে ইদানীং যেন খুব বাড়াবাড়ি। কাজ করার আর সে শক্তি নেই, দেহ রাখার বাসনা ও মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। মনে মনে বলেন যদি তাঁকে ডাকতেই পারব না, তবে আর এ দেহ রেখে ফল কি ?

সনাতন এসে হরিদাসের চরণ বন্দনা করলেন।

হরিদাস তাকে টেনে নিয়ে বাহুপাশে আবদ্ধ করলেন। প্রভুর

কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই প্রভু সপার্ষদ সেখানে উপনীত হলেন।

প্রভুকে দেখে দুজনে তাঁর পায়ে পড়লেন। প্রভু সনাতনকে দেখেই দুই বাহু বাড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। সনাতন পিছিয়ে গেলেন, বললেন—প্রভু আমাকে স্পর্শ করবেন না—আমি কুষ্ঠগ্রস্থ, অস্পৃশ্য।

প্রভূ সে কথা কানে তুললেন না। তিনি জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভূর অঙ্গে ক্লেদ লেগে গেল—তা দেখে ভক্তেরা মনে ব্যথা পেলেন।

সনাতন হরিদাসের আশ্রয়ে রইলেন। হরিদাসের জন্যে প্রভূর কিঙ্কর গোবিন্দ রোজ প্রসাদ আনতেন। প্রভূর ইচ্ছায় সনাতনের জন্যেও তেমনি আসতে লাগল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হলো।

সনাতনের মনের ইচ্ছা, জগন্নাথদেবের রথচক্রতলে জীবন বিসর্জন দেবেন। রথেরও আর বড় বিলম্ব নেই।

সনাতন এসেছেন বৈশাখ মাসে—এখন আষাঢ় মাস।

তিনি একদিন হরিদাসকে বললেন—প্রভূর কাছে শুনলাম অনুপ দেহত্যাগ করেছে, আর রূপ এখানে দশ মাস থেকে বৃন্দাবনে গেছে। আমি এখানে একা। আর এ রোগক্লিষ্ট দেহ বহন করি কেন?

হরিদাস বললেন—তুমি কেমন করে জানলে যে তোমার জীবনে আর কোনও প্রয়োজন সাধিত হবে না?

সনাতন বললেন—প্রভূ বলেছেন বৃন্দাবনে হরিনাম প্রচার করতে, কিন্তু যে অস্পৃশ্য, ব্যাধিগ্রস্থ তার কাছে কে আসবে? তার মুখের হরিনামই বা কে গ্রহণ করবে?

—প্রভুই ত বলেছেন, যে পরিমাণে তুমি লোকের কাছ থেকে ঘৃণা পাবে, সেই পরিমাণে তূমি কৃষ্ণকৃপা লাভ করবে।

—আমিও ত শুনেছি তাঁর কাছে, রোগ-শোক, নিন্দা-অপবাদ,

ঘৃণা-অপমান সবই ভগবান পাপ ক্ষয়ের জন্যে প্রেরণ করেন। যারা সুখে আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকে, তারা ভগবান থেকে অনেক দূরে।

কিন্তু আমার কথা এই, যে নিজে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য সে হরিনাম প্রচার করবে কেমন করে?

এমন সময় হরিদাসের বালক ভৃত্য বোবা-কালা রঘুয়া কোত্থেকে ছুটে এসে য়্যাঁ, য়্যাঁ করে প্রভুর আগমন বার্তা জানিয়ে দিল।

প্রভু এসেছেন একা।

সনাতন বুঝলেন, অন্তর্যামী ভগবান তাঁর মনের ভাব বুঝে তাঁকে তিরস্কার করতে এসেছেন। তাই প্রভু আজ একা।

উভয়ে চরণ বন্দনা করলেন।

প্রভু যখন আলিঙ্গনোদ্যত হলেন, তখন সনাতন পিছিয়ে গেলেন প্রভু ডাকলেন—সনাতন কাছে এস।

—ক্ষমা করবেন প্রভু কাছে আর যাব না; আমার অঙ্গের ক্লেদ আপনার অঙ্গে লেগে যায় এটা আমি সহ্য করতে পারি না।

প্রভু সনাতনকে ধরবার জন্য যত এগিয়ে যেতে লাগলেন সনাতন তত পিছিয়ে যেতে লাগলেন। প্রভু বললেন—সনাতন আমি সন্ন্যাসী, উচ্ছিষ্ট চন্দনে আমার সমজ্ঞান হওয়া উচিত।

—আমি ত সন্ন্যাসী নই প্রভু তাই সমজ্ঞান আমার সম্ভব নয়। আমি কেমন করে সহ্য করব তুমি এই দুর্গন্ধময় ক্লেদ শ্রীঅঙ্গে মাখবে—যাঁর চরণে লোকে তুলসী চন্দন দেয় তাঁর অঙ্গে আমি ক্লেদ দেব! আমি পারব না—ক্ষমা কর।

—তোমার অঙ্গে দুর্গন্ধ কোথায়? আমি ত চন্দনের গন্ধ পাই।

সত্যিই সনাতনের অঙ্গে চন্দন গন্ধ সনাতন ছাড়া সকলেই সেটা উপলব্ধি করেছেন। যেদিন প্রভু তাঁকে প্রথম আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন সেই দিন থেকেই সনাতনের অঙ্গে চন্দন গন্ধ।

—সনাতন উত্তর করলেন—যাঁর অঙ্গে পদ্ম গন্ধ তিনি দুর্গন্ধ কোথাও পান না।

প্রভু পরাস্ত হলেন। বললেন তুমি জান না সনাতন ভক্তের অঙ্গ আমার কাছে কত প্রিয়।

—জগতে আমার একটিও ভক্ত নেই, আমি কেমন করে তা জানব প্রভু?

প্রভু তখন উপায়ান্তর না দেখে ছুটে গিয়ে সনাতনকে ধরলেন। তাঁকে বুকের ওপর অতি প্রীতি ভরে টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন। প্রভুর সোনার অঙ্গ ক্লেদে ভরে গেল—সনাতন মর্মাহত হলেন। তার পরে প্রভু দুই জনকে দুই হাতে ধরে এনে পিঁড়ায় বসলেন। অতি গম্ভীর কণ্ঠে সনাতনকে জিজ্ঞাসা করলেন —আত্মঘাতীকে তুমি ভক্ত বলে মনে কর কি সনাতন?।

সনাতন চমকে উঠলেন—বললেন—এ সব কথা কেন প্রভু?

—বল সনাতন যে আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প সে কি কৃষ্ণের নিকট অপরাধী নয়?

—প্রভু প্রভু—

—শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস না হারালে কেউ আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হতে পারে না। সে শুধু নিজের সুখ দুঃখ অন্বেষণ করে —জগতের কল্যাণ, কৃষ্ণের করুণা এ সব কথা স্মরণেই আনেনা। শোন সনাতন জীবনে কখনো বিস্মৃত হয়ো না, কৃষ্ণ কখনও নিষ্ঠুর মন—চিরকল্যাণময়।

—ক্ষমা করুন প্রভু আমি ভুল বুঝেছি।

—উত্তম—আমি তোমার :প্রতি প্রসন্ন হলাম। আর একটা কথা আছে তুমি এখন নীলাচল ত্যাগ করো না।

এ সময় প্রভুর পার্ষদরা এসে উঠানে দাঁড়ালেন।

সনাতন বললেন—প্রভু আমাকে ছুটি দিন আমি বৃন্দাবনে যাই।

—তোমায় স্পর্শ করলে দেবতারাও পবিত্র হন। কেন তুমি অকারণ সঙ্কুচিত হও?

—প্রভু এ অস্পৃশ্য পামরকে এত করে বাড়িয়ে তুলবেন না।

—তোমার দৈন্যে আমি মুগ্ধ হলাম তুমি বর প্রার্থনা করো।

—প্রভু আপনি যখন আমার সম্মুখে তখন আমায় কিছু চাইবার নেই।

—না সনাতন তা হবে না—তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করো আমাকে প্রত্যখ্যান করো না।

—প্রভু যখন দাসের প্রতি এতই প্রসন্ন হয়েছেন তখন এই বর চাই—প্রভু ক্ষমা :করবেন আপনার সৃষ্টির যদি কোন বিঘ্ন না ঘটে তবে এই বর প্রদান করুন, যেন এই মূক বালক রঘুয়া বাক শ্রবণ শক্তি লাভ করে।

—তথাস্তু।

সনাতন ভূমিষ্ট হয়ে প্রভুকে প্রণাম করলেন। ভক্তবৃন্দ হরি ধ্বনি করে উঠলেন। প্রভু বললেন—সনাতন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

—আমার চাইবার যে আর কিছুই নেই প্রভু।

—তোমার রোগমুক্তি?

—না এ আমি বেশ আছি প্রভু, সম্মান নিয়ে কি করব? ঘৃণাই যে আমার সম্পদ। ব্যাধি আমাকে দৈন্য শিখিয়েছে আমার পুঞ্জীভূত পাপও ক্ষয় হচ্ছে। তুমি যা দিয়েছ তা আমি ছাড়তে চাই না।

—সনাতন তুমি যথার্থ কৃষ্ণভক্ত—

—এ সব কথা বলবেন না প্রভু, আমি দীন—

—তুমি সকলের চেয়ে আমার প্রিয়। এস সনাতন আমার হৃদয়ে এসো।

—না প্রভু আমার এই ক্লেদ—

—তোমাকে স্পর্শ করে আমি পবিত্র হবো।

বলে প্রভু উঠানে নামলেন।

সনাতন পিছিয়ে গেলেন—কিন্তু প্রভু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জোর করে বুকে টেনে নিলেন।

প্রভুর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।

ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠলেন।

অবশেষে প্রভু যখন সনাতনকে ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন সকলে পরম বিস্ময়ে দেখল সনাতনের দেহ ব্যাধিমুক্ত।

॥ ছাব্বিশ ॥

রঘুনাথ আঠারো দিনের পথ বারো দিনে অতিক্রম করে নীলাচলে এলেন। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন তাঁর আহার জুটেছিল। যখন নীলাচলে প্রভুর সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার।

প্রভু রঘুনাথকে উঠিয়ে আলিঙ্গন দান করলেন। রঘুনাথের সারা দেহ জুড়িয়ে গেল তাঁর সকল কষ্টের অবসান হলো।

রঘুনাথ সমুদ্রস্থানে চলেছেন কিন্তু হরিদাসের পদ বন্দনা না করে যেতে পারেন না। তাঁর আশ্রমে এসে দেখলেন হরিদাস এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন। এই অপরিচিত ব্যক্তিই সনাতন।

রঘুনাথ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

হরিদাস বলছেন—তোমার মত জ্ঞানী ও পণ্ডিতের কাছে এ কথা শুনব প্রত্যাশা করিনি সনাতন ঠাকুর।

সনাতন বললেন—প্রেম কি এতই দুর্লভ?

—হ্যাঁ এতই দুর্লভ। শিখি মহাতি বা রামানন্দ রায়ের কথা যে উল্লেখ করলেন আমার বিবেচনায় তাঁরাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেননি।

—তবে কি জগতে কেউ কৃষ্ণ প্রেম পান নি?

—বিশুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম কেউ পাননি। প্রেম কাকে বলে প্রভু তা আচরণ করে জীবকে দেখাচ্ছেন পরে আরও দেখাবেন।

—গোপীদের অনুরাগও কি প্রেম নয় ?

—তাঁদের অনুরাগই প্রেম আর তোমার আমার অনুরাগ প্রেম নয়। গীতায় বা গীতাধর্মাশ্রয়ীর হৃদয়ে প্রেম নেই। প্রেমের কথা শুধুমাত্র আছে ভাগবতে।

সনাতন উত্তর করলেন না, নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। এই অবসরে রঘুনাথ এগিয়ে এসে হরিদাসের চরণে প্রণত হলেন।

হরি দাস তাঁকে চিনতে পেরে সাদরে বুকে ধারণ করলেন ও সনাতনের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। নাম শোনা মাত্র রঘুনাথ তাঁর চরণে প্রণাম করলেন। বললেন আপনি আমার আদর্শ নিত্য পূজ্য। আজ বহু সৌভাগ্যে আপনার চরণ ধূলি মাথায় ধরতে পেলাম। সনাতন আলিঙ্গনদানে রঘুনাথকে কৃতার্থ করলেন।

পথের পরিচয় দিতে দিতে রঘুনাথ বললেন—জঙ্গলের ভেতর এক বালক অদ্ভুত উপায়ে আমার জীবনরক্ষা করেছে।

—কি রকম ?

—এক ভল্লুক আমায় তাড়া করেছিল আমি কৃষ্ণকে ডাকতে ডাকতে ছুটতে লাগলাম। যখন ছুটতে পারলাম না তখন কৃষ্ণের ওপর সমস্ত নির্ভর করে আমি চোখ বুজে ভল্লুকের আক্রমন প্রতিক্ষা করতে লাগলাম ভল্লুক না এসে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে এক বালক এল। বালকের তাড়নায় ভল্লুক পালাল।

—বালকটি দেখতে কেমন ?

—অতি সুন্দর কৃষ্ণ বর্ণ। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

—বাড়ি কোথায় বললেন ?

—বললে বাড়ির কোন ঠিকানা নেই যেখানে ভালবাসার লোক থাকে সেই খানেই তার বাড়ি। আরও বললে নীলাচলে তার ভালবাসার লোক আছে, নীলাচলে আমার সঙ্গে তাই আসছিল।

—এলেন না কেন ?

—এসেছিল। আমি যেমনি বিদ্যার গর্ব করেছি আর অমনি ছুটে পালাল। বললে পণ্ডিতের কাছে সে থাকে না।

হরি দাস নীরবে চোখ মুছলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। অঙ্গে পুলক দৃষ্ট হলো। দেহ সহসা কম্পিত হয়ে উঠল। ক্ষণমধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে জড়িত কণ্ঠে বললেন—রঘুনাথ ত্রিভুবনের নিধিকে তুমি পেয়েও ছেড়েছ। কাছে পেয়েও চিনতে পারলে না। তোমারই বা অপরাধ কি? তিনি কৃপা না করলে ব্রহ্মারও সাধ্য নাই তাঁকে চিনে ওঠেন?

রঘুনাথ স্তম্ভিত হলেন; অবশেষে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। দুঃখে, অনুতাপে রঘুনাথ দগ্ধ হতে লাগলেন।

সেইদিন দুপুরে রঘুনাথের জ্বর হলো; তা হবারই কথা। পথ-শ্রম, উপবাস, উদ্বেগ সুখের দেহ দিয়ে সহ্য করতে পারলেন না। আটদিন পর জ্বর ছাড়ল—তখন সে খুব ক্ষুধা অনুভব করল। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু তিনি গ্রহণ করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা।

তখন তিনি মনে মনে প্রভুর জন্যে রন্ধন করতে লাগলেন। মনে মনেই সূক্ষ্ম চালের ভাত, শাক, পায়স রান্না করে প্রভুকে আকণ্ঠ খাওয়ালেন।

দুপুরে স্বরূপ দামোদর এসে রঘুনাথকে বললেন—তুমি নাকি অসময়ে প্রভুকে ভোগ দিয়েছো?

রঘুনাথ বললেন—কই, আমি ত শয্যায় পড়ে আছি, স্নানও করিনি!

—কিন্তু প্রভু বললেন তোমার পায়স আকণ্ঠ খেয়ে তাঁর অজীর্ণ হয়েছে।

—ও, বুঝেছি। প্রভু—আমার প্রভু, তুমি এত দয়াল? এত করুণাময়? এ কাঙালের ওপর এত কৃপা!

রঘুনাথের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি ধূলোয় লুটিয়ে

কেঁদে উঠলেন। আর ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই—তিনি প্রভুকে দেখতে ছুটলেন।

রথযাত্রা সন্নিকট। গৌড় থেকে ভক্তেরা এসেছেন। তাঁরা সংখ্যায় প্রায় দুইশত হবেন। নীলাচলের ভক্ত বড় কম নয়। সকলেই সচল জগন্নাথকে দর্শন করতে এসেছেন, অচল জগন্নাথ শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রথম যাত্রার দিন রঘুয়া এসে হরিদাসকে বললেন—প্রভু আপনাদের ডাকছেন, তিনি রথের আগে দাঁড়িয়ে আছেন।

হরিদাস আর সনাতন ছুটে চললেন।

প্রভু তাঁদের গাঢ় আলিঙ্গন করে বললেন—তোমরা নিজেদের অস্পৃশ্য মনে করে মন্দিরে যাও না, আজ প্রাণভরে জগন্নাথকে রথের ওপর দর্শন কর। রথে জগন্নাথ দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

দুজনে প্রভুকেই দর্শন করতে লাগলেন। যেন কত কাল, কত যুগ তাঁকে দেখেননি। প্রভু বললেন—জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর।

সনাতন উত্তর করলেন—এই ত দেখছি প্রভু, জগন্নাথ আমার সামনে—

প্রভু পেছন ফিরলেন।

রথ চলতে লাগল। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র রথের আগে আগে সুবর্ণ-মার্জনী দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে মার্জিত পথের ওপর চন্দনের জল ছিটাতে ছিটাতে চললেন। প্রভু তাঁর নিজগণকে মালা চন্দন দিয়ে শক্তি সম্পন্ন করলেন; পরে তাঁদের নিয়ে সাতটি কীর্তন সম্প্রদায় গঠিত করলেন। তাঁরা গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে রথের আগে-পিছু চললেন। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই নেচে নেচে জীবন দিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঁই করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁই নাহি যায় আমার মায়ায়॥ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এইরূপে রথযাত্রা সমাপ্ত হলো। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস, দোল-যাত্রা, একে একে সব পর্বই শেষ হলো। সনাতনের বিদায়ের সময় এলো। সকলেরই মন অবসন্ন। সকলেই জানেন সনাতনের এই শেষ বিদায়। প্রভু তাঁকে প্রায় এক বছর কাছে রেখে শিক্ষা ও শক্তি দিয়েছেন। যে শরাসন থেকে নিত্যানন্দ রূপ দিব্যাস্ত্র বঙ্গের তমোরাশি বিনাশ করতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেই শরাসন থেকে সনাতনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র বৃন্দাবনের অন্ধকাররাশি ধ্বংস করতে নিক্ষিপ্ত হলো।

বিদায়ের আগে সনাতন হরিদাসকে বলছিলেন—তুমি তাড়াতাড়ি দেহ রাখবে বুঝলাম। তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা।

—এই দেহ নিয়ে তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ, কিন্তু বৃন্দাবনে তুমি আমার দর্শন পাবে।

—প্রভু আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি একা সে জঙ্গলে গিয়ে কি করব?

—তুমি সেখানে একা পড়বে না, তোমাকে সাহায্য করতে আরও অনেকে যাবেন। প্রভু অস্ত্রে শান দিচ্ছেন।

—অস্ত্র? আর কই?

—রূপকে পেয়েছ ক্রমে আরও পাবে; এই রঘুনাথই এক দিন যাবেন।

বলতে বলতে রঘুনাথ সমুপস্থিত হলেন। তিনি দুইজনের চরণ বন্দনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় যাব হরিদাস ঠাকুর?

—এই শ্রীবৃন্দাবনে।

—প্রভু বলেছেন, আমি তাঁরই কাছে থাকব।

—আপাততঃ বটে। তারপর বৃন্দাবনে সনাতনের কাছে থাকবে।

রঘুয়া এসে সংবাদ দিল প্রভু এসেছেন। হরিদাস প্রভৃতি এগিয়ে তাঁর চরণবন্দনা করলেন। প্রভু সপার্ষদ পিঁড়ির ওপর উপবেশন করলেন। প্রভুর বদন বিষাদাচ্ছন্ন, তাই ভক্তদেরও মুখ মলিন। প্রভু বললেন—সনাতন তোমায় বিদায় দিতে আমার প্রাণ প্রাণ ছিঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু উপায় কি? জীব উদ্ধার কিভাবে হবে? তুমি যদি না যাও আমাকে যেতে হয়।

—ইচ্ছাময়, জীব উদ্ধার মুহূর্তে হয়।

—কিরূপে সনাতন?

—তুমি জীবের সমুদয় পাপ আমাকে দাও আমি তাদের সকল পাপ নিয়ে অনন্তকাল নরক ভোগ করি; তা হলে তোমার জীব উদ্ধার সহজে হয়। ইচ্ছাময়, আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

—তুমি নরকে দুঃখ পেলে সে দুঃখ কি আমার প্রাণে লাগবে না সনাতন?

—সে দুঃখে আমি অম্লানবদনে সহ্য করব, কিন্তু তুমি যে জীব উদ্ধারের জন্য পাহাড় জঙ্গলে পায়ে হেঁটে অনশনে ছুটাছুটি করে বেড়াবে; তা আমি সহ্য করতে পারব না, তোমার চরণতলে একটি তৃণের আঘাত লাগলে আমার যে কোটি কল্প নরক যন্ত্রণার চেয়েও বেশী লাগবে প্রভু।

প্রভুর চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল গড়াতে লাগল। সনাতন যুক্ত করে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে। তাঁর ক্লিষ্ট বদন দেখে সকলেরই চোখে জল এলো। ক্ষণমধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রভু বললেন—সনাতন জীব উদ্ধারের জন্যেই বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছি কৃষ্ণনামে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি, অন্য কোথাও যাবার আমার শক্তি নেই; জীবনের অবশিষ্ট কাল জগন্নাথের চরণতলে কাটাব বাসনা করেছি।

—প্রভু আমি প্রফুল্ল অন্তরে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করলাম। বুঝেছি, শ্রীচরণ দর্শন আর আমার ভাগ্যে নেই।

—আমার মন তোমারই সঙ্গে যাবে সনাতন; তুমি যখনই আমাকে ডাকবে, তখনই আমাকে দেখতে পাবে।

—তবে আর কিছু চাই না প্রভু, যথেষ্ট আমাকে দিলে। যদি অনুমতি হয়, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—কি কথা সনাতন?

—কাশীধামে আপনার কোলে এক মহাপুরুষকে দেখেছিলাম, তিনি আমার চিত্তকে অধিকার করে আমাকে বড় ব্যাকুল করে তুলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি সেই মহাপুরুষের পরিচয় জানি না।

—তুমি কি তাঁকে আবার দেখেছ?

—ঠিক দেখিনি, গান শুনেছি। বৃন্দাবন থেকে আসার পথে একদিন অমি বনের ভেতর অন্ধকারে পথ হারিয়ে বড় বিপাকে পড়েছিলাম, তিনি গান গাইতে গাইতে এসে আমাকে সাহস দিলেন। আমি কণ্ঠস্বরে তাঁকে চিনেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না।

—তিনি সত্যিই এক মহাপুরুষ; অনেক দিন হলো তিনি পার্থিব দেহ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু অন্য ব্যক্তির পার্থিব দেহ আশ্রয় করে মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়ে থাকেন। জীবের উদ্ধারই এই সব মহাপুরুষদের ব্রত; ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আর বিপদ দেখলে সাধ্যমত সাহায্য করেন। এই মহাপুরুষ রঘুনাথকে সাহায্য না করলে রঘুনাথ আজ গৃহের বার হতে পারতেন না। যে দেহ তুমি বা রঘুনাথ দেখেছ, সে দেহ তাঁর প্রকৃত দেহ নয়।

ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝলেন সে দেহধারী কে। কিন্তু সনাতন বা রঘুনাথ কিছুই বুঝলেন না—তাঁরা প্রভুর দিকে চেয়ে রইলেন। প্রভু বললেন—তোমরা তাঁর নাম শুনে থাকবে, তিনি আমার গুরুর গুরু—মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী। তিনি দয়া করে একবার মাত্র আমায় দর্শন দিয়েছিলেন। আর কি তাঁর কৃপা হবে?

তারপর বিদায়ের পালা। প্রভু সনাতনের গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। প্রভুর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে সনাতন ভক্তদের চরণ বন্দনা করলেন। পরে নীলাচল ত্যাগ করে ধীর পায়ে চললেন। তিনি কিছুদূর এগিয়ে গেলে রঘুনাথ ছুটে এসে তাঁকে একটি দণ্ড ও একটি করঙ্ক প্রদান করল। পরে সনাতনের চরণ ধূলি মাথায় নিয়ে কাতর মুখে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে কেঁদে ফেলল। সনাতন তাকে বুকে নিয়ে সাদরে বললেন রঘুনাথ কেঁদো না তোমাতে আমাতে শীগগিরই আবার দেখা হবে।

॥ সাতাশ ॥

লোকনাথ আর ভূগর্ভ বৃন্দাবনে কুটির বেঁধে বাস করছেন। যমুনাতীরে চিরঘাটে তাঁদের আশ্রম। দুজনে একসঙ্গে গৌড় থেকে বৃন্দাবনে এসেছেন—সে অনেক দিনের কথা। বৃন্দাবন তখন জঙ্গলাবৃত। সে অনেক দিনের কথা। প্রভুর আদেশ ছিল চির ঘাটে বাস করবার—কিন্তু তাঁরা চিরঘাট খুঁজেই পান না, কেউ কিছু বলতে পারে না। অবশেষে এক অর্ধোন্মাদের কাছ থেকে তাঁরা চিরঘাটের সন্ধান পেলেন। দুজনে কুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন সেখানে।

একদিন অপরাহ্নে ঘাটের ওপর বসে লোকনাথ গোস্বামী বলছিলেন—কি দুর্ভাগ্য বল দেখি ভূগর্ভ। আজ ছয় বছর প্রভুর প্রতীক্ষায় বসে থেকেও তাঁর দর্শন পেলাম না।

ভূগর্ভ হেসে বললেন—প্রভু স্বেচ্ছায় দর্শন না দিলে কি করে পাবে বল ? ত্রিভুবন ঘুরলেও তাঁর দেখা পাবে না।

—কেন আমাদের অপরাধ কি? প্রভুর সব আদেশ আমরা যথাযথ পালন করেছি—ধীরে ধীরে লুপ্ত বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করছি।

সে কথায় উত্তর না দিয়ে ভূগর্ভ বললেন—আচ্ছা অদূরে একজন লোক দেখছি না ? আমাদের দেশের মানুষ বলে মনে হচ্ছে, কি সুন্দর পুরুষ।

লোকনাথ বললেন—কি প্রেমময় স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

আগন্তুক এসে দুজনকে নমস্কার করলে তাঁরাও প্রতিনমস্কার করে বললেন—কোন্ দেশ থেকে আপনার আগমন হয়েছে?

—আপাততঃ নীলাচল থেকে আসছি। কি কাজের জন্যে তা জানিনে—প্রভু পাঠিয়েছেন বলে এসেছি।

—প্রভু পাঠিয়েছেন? তিনি কোথায়?

—নীলাচলে।

—হায় হায়, আমরা কতযুগ যেন তাঁর দর্শন পাইনি!

ভুগর্ভ বললেন—আপনার নাম?

—দাসের নাম সনাতন।

—আপনার দৈন্য আপনাকে এত বড় করেছে।

—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। রূপ কোথায়?

—তিনি বৃন্দাবনেই আছেন।

সনাতন উঠলেন। তাঁর সংকল্প একস্থানে বেশিক্ষণ থাকবেনএক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করবেন না। দুই রাত্রি এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নেবেন না—পাছে বৃখের ও-পর মায়া পড়ে। মাথায় কাঠ বয়ে এনে সামান্য যা পান, তাই দিয়ে আহার্য্য কিনে আসেন। তার অধিকাংশ দরিদ্রদের দান করে সামান্য কিছু খান। গৌরের সর্বময় কর্তা এইভাবে বিন কাটান। তাঁর আহারের পাত্র বৃক্ষপাত্র, শয্যা পৃথিবী, সম্বল ছিন্ন কাঁথা, আশ্রয় বৃক্ষতল। এই কঠোর ব্রত যখন তিনি পালন করে চলেছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বছর।

একদিন দুপুরে এক বৃদ্ধ ব্রজবাসী সনাতনের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন।

সনাতন কিছু আগে কাঠ নিয়ে ফিরেছেন। বললেন—আপনি এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিন, আমি সত্বর আসছি। বনে কাঠের বোঝা নিয়ে তিনি বাজারের দিকে ছুটলেন। কিছুক্ষণ পরে কাঠ বিক্রি করে আহার্য কিনে এনে তিনি রান্না করতে লাগলেন। রান্না করতে অনেক

সময় লাগল। রান্না যখন প্রায় শেষ তখন হঠাৎ ব্রজবাসী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে। বিকেল হয়ে এলো।

সনাতনের মুখ মলিন হয়ে এলো। তিনি হাত জোড় করে বললেন —আর একটু অপেক্ষা করুন। আমার অপরাধ হয়েছে।

ব্রজবাসী বললেন—বৃন্দাবনে কি করতে এসেছ বাবা?

—তা জানি নে। প্রভু পাঠিয়েছেন তাই এসেছি।

—তিনি কি তোমায় কাঠ কাটতে এ দেশে পাঠিয়েছেন বাবা?

—না।

—বাজার করা, কাঠ বেচা, হিসেব করা এ সবের জন্যেও বোধ হয় পাঠান নি।

সনাতন লজ্জায় মুখ নিচু করে রইলেন।

ব্রজবাসী বললেন—আর দেখ বাবা, রান্না, শয়ন এসব এদেশ থেকেও তোমার চলত বলে মনে হয়।

সনাতন কাঁদতে লাগলেন।

বললেন—আমায় কি করতে হবে উপদেশ দিন।

ব্রজবাসী যেতে যেতে বললেন আমি উপদেশের কি জানি বাবা?

সনাতন সহসা চীৎকার করে উঠলেন—আমি তোমায় চিনেছি মহাপুরুষ—তুমি সেই দেবতা মাধবেন্দ্রপুরী। দাঁড়াও, দাঁড়াও আমায় উপদেশ দিয়ে যাও।

—জপ করতে করতে নিজেই সব জানতে পারবে—উপদেশের প্রয়োজন হবে না।

ব্রজবাসী সত্বর বনান্তরালে অদৃশ্য হলেন।

সনাতন সজল নয়নে ফিরে এসে প্রস্তুত অন্ন যমুনার জলে ফেলে দিলেন। তারপর আহারের জন্য মাধুকরী আরম্ভ করলেন। তাও ভিক্ষার্থ একদিন দুই গৃহস্থের বাড়ি যেতেন না। একস্থানে যা পেতেন,

তাতেই তিনি তৃপ্ত। বৃক্ষতল ছেড়ে যমুনার তীরে একটি ক্ষুদ্র কুটির বাঁধলেন। মৃন্ময় জলপাত্র রন্ধনপাত্র সংগ্রহ করলেন। দিবাভাগের মাত্র চার দণ্ড আহার নিদ্রার জন্য ধার্য করে বাকী সময় তিনি জপ আর নামে অতিবাহিত করতে লাগলেন।

॥ আঠাশ ॥

বছরের পর বছর এইভাবে গড়িয়ে চলল। প্রভু তখন অপ্রকট, হরিদাস দেহ রেখেছেন। শ্রীরূপ, অনুপের পুত্র শ্রীজীব, বৃন্দাবনে স্বতন্ত্র কুটির উঠিয়ে বাস করছেন। গোপাল ভট্ট, ভট্ট রঘুনাথ, রঘুনাথ দাস (ভক্ত রঘুনাথের কথা আগে বলা হয়েছে) প্রভৃতি প্রভুর বহু ভক্ত বৃন্দাবনে এসে বাস করছেন।

বৃন্দাবন আর সে জঙ্গলময় বৃন্দাবন নেই। চারদিকে সর্বশোভাময় মন্দির—ভক্তকণ্ঠ উচ্চারিত কৃষ্ণনামে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত। সনাতন এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্তা—শ্রীবৃন্দাবনের রাজা। তিনি এখন বৃদ্ধ।

একদিন সকাল বেলা।

যমুনায় স্নান করতে গিয়ে সনাতন দেখলেন, একটি স্পর্শমনি স্বল্প জলে পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা স্পর্শ করতে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না। মণিতে তাঁর প্রয়োজন নেই—অপরেও লোভ করলে তার সর্বনাশ হবে। বিষয়ী লোক বৃন্দাবনে নেই, থাকলে তাকে মণিটা দিতে পারতেন। ভেবে চিন্তে তিনি এক টুকরো চাপরা সংগ্রহ করে তা দিয়ে মনিটা উঠিয়ে বালুর নিচে পুঁতে রাখলেন।

স্নান পূজা শেষ করে দীর্ঘক্ষণ পরে তিনি তীরে উঠলেন। তখন এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এসে তাঁর চরণে পড়লেন।

সনাতন বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ আমার নমস্য—আমাকে অপরাধী করবেন না।

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—আপনি সনাতন গোস্বামী?

সনাতন করজোড়ে বললেন—আমাকে আপনার দাস বলে জানবেন। আমার দ্বারা কি হতে পারে আজ্ঞা করুন।

ব্রাহ্মণ বললেন—বলছি, আগে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন। আমার নাম জীবন, বাস বর্ধমানের কাছে মানকরে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—আমার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, চরিত্রদোষে তা নষ্ট করেছি। স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে আমি আসি কাশীধামে। অর্থ-কামনায় বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করি। বিশ্বনাথ প্রসন্ন হয়ে স্বপ্নে আদেশ করেছেন যে, আপনার কাছে এলে অর্থ পাব। তাই অর্থ প্রাপ্তির আশায় আপনার চরণতলে উপস্থিত হয়েছি।

সনাতন বললেন—আমি অর্থ কোথায় পাব—আমি ভিক্ষাজীবী, এক কপর্দকেরও সম্বল আমার নেই।

ব্রাহ্মণ বললেন—আপনি আমাকে প্রতারণা করবেন না।

—প্রতারণা ত করিনি ব্রাহ্মণ! আমার কুটিরে চল, সেখানে যা কিছু আছে, তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার।

ব্রাহ্মণ তখন মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল। বলল:

'হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল
কিংবা মুক্তি স্বপন বা প্রলাপ দেখিল।'—ভক্তমাল গ্রন্থ

তখন হঠাৎ সনাতনের মনে পড়ল, তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে একখণ্ড স্পর্শমণি মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছেন। মনে হওয়ামাত্র তিনি বললেন—কেঁদো না ব্রাহ্মণ. মহাদেব তোমায় প্রতারণা করেননি। আমার স্মরণ হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে একখণ্ড স্পর্শমণি আমি মাটির মধ্যে পুঁতে রেখেছি—তুমি তা তুলে নিতে পার।

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন—স্পর্শমণি? যার স্পর্শে লোহা সোনা হয়? কই, কোথায় সে মণি? দাও, দাও আমাকে।

—ওখানকার মাটি খুঁড়ে দেখ। আমি ওটা স্পর্শ করব না।

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়ে বললেন—এত মাটি খুঁড়লাম, কই মণি ত পাচ্ছি না। তুমি একবার দেখ।

—আমি স্নান করেছি, মণি স্পর্শ করব না, দেখবও না। তুমি ভাল করে দেখ, এখানেই কোথায় আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি, এই যে মণি! বাঃ, কি উজ্জ্বল। আমি এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী। ধন্য মহাদেব। চললুম গোঁসাই।

অভিবাদন করারও আর অবসর হল না, তিনি দ্রুতপায়ে চলে গেলেন। সনাতন চিত্র পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণের আনন্দ দেখতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—আচ্ছা মণি ত পেলাম, কিন্তু ভিক্ষাজীবী দরিদ্র গোঁসাই এমন অমূল্য ধন আমায় দিলে কেন? প্রতারণা করেনি ত? পরীক্ষা করে দেখা যাক।

এই ভেবে তিনি পরশমণি তাঁর হাতের মাতুলীতে ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটি সোনার মাদুলি হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ তখন ভাবতে লাগলেন, যে ধন কোন রাজা বাদশার ভাণ্ডারে পর্যন্ত নেই, যে রত্ন আমায় দিলে কেন? নিজে রাখলেই ত পারত!

'রাখবার থাক কার্য, স্পর্শ নাহি করে,
স্পর্শের থাকুক কাজ, ঘৃণায় না হেরে।

মণির চেয়েও বড় কোন বস্তু গোঁসাই নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমিও ত সেই বস্তুর কামনা করতে পারি। দেখছি ঠাকুরেরর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। ধন চেয়েছিলাম তিনি ঢেলে দিলেন। এবার তাঁকে চোখে দেখি না! ছি ছি, আমি তুচ্ছ ধনের লোভ করেছিলাম—তার চেয়ে সেই পরম ধন যদি পাই যা গোঁসাই পেয়েছেন।

এই ভেবে তিনি সনাতনের পায়ে গিয়ে পড়লেন। বললেন —ঠাকুর আমি মণি চাই না, মণির মণি সেই নীলকান্তমণি আমায়

দাও। জন্মজন্মান্তরের পরম সম্পদ আমায় দান কর—আমায় কৃপা কর।

সনাতন বললেন—তাহলে আগে মণি ত্যাগ কর।

ব্রাহ্মণ হাসতে হাসতে পরশমণি যমুনার জলে নিক্ষেপ করলেন।

সনাতন তখন সেই ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গণ করে তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন।

সেই মণির কথা শুনলেন দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ। তাঁর লোভ গর্জে উঠল—যমুনার গর্ভ থেকে মণি উদ্ধার করার জন্যে তিনি স্বয়ং এলেন। আর যে লোকটি এই মহামূল্যবান অমূল্য সম্পদকে হেলায় তুচ্ছ করে যমুনার জলে ফেলে দেয় তাঁকে দেখবার ইচ্ছাও যে তাঁর ছিল না এমন নয়। সৈন্যসামন্ত এনে তিনি বৃন্দাবনের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন।

অনেক ডুবুরী যমুনায় নেমেও মণি পেলো না। অবশেষে হাতী নামানো হলো—তাদের পায়ে লোহার মোটা শিকল। অনেক খোঁজা খুঁজির পর একটি হাতীর পায়ের শিকল সোনার হয়ে গেল —কিন্তু মণির সন্ধান মিলল না। যমুনার জল কর্দমাক্ত হয়ে উঠল —তখন বাদশা নিরস্ত হলেন।

বাদশা সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করতে এলেন।

সনাতন বিষয়ী লোকের মুখ দর্শন করেন না, তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। কাজেই তিনি মাথা নিচু করে রইলেন। ক্ষণশ করে বাদশা বললেন— আপনার কোন কামনা আছে? আমি দিল্লীর বাদশা, আমার অসীম ক্ষমতা, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

সনাতন কোন উত্তর দিলেন না।

বাদশা বললেন—আপনার জন্যে আমি কিছু করতে চাই—দয়া করে আমায় সে অধিকার টুকু দিন।

সনাতন মাথা তুললেন না। শুধু বললেন—আপনার যখন

এতই করুণা তখন আমার আশ্রমের ধারটুকু বাঁধিয়ে দিন, যাতে যমুনার জলে না ভেঙে যায়।

বাদশা কৃতার্থ হলেন। তখনই তাঁর সামনে কাজ আরম্ভ হলো। শত শত লোক মাটি তুলতে লাগল। সব মাটি যমুনার তরঙ্গে ভেঙে যাচ্ছিল তা তুলে আশ্রমে ফেলতে লাগল। বাদশা বিস্মিত নয়নে দেখলেন—সেই সব মাটি মণি মুক্তাময়। কত দুষ্প্রাপ্য মহামুল্য মণি মাটির মধ্যে রয়েছে। বাদশা বুঝলেন সনাতনের ইচ্ছায় এই সব মণি মুহূর্তে সৃষ্ট হয়েছে।

তিনি তখন হাঁটু গেড়ে সনাতনের সাম্‌নে বসে বললেন—আমায় ক্ষমা করুন, আমার শিক্ষা হয়েছে, আমার গর্ব চূর্ণ হয়েছে। আপনি যা পেয়েছেন তার তুলনায় পৃথিবীর ঐশ্বর্য অতি সামান্য। আপনার তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র। এখন বিদায় নিলাম—বিরক্ত করতে আমি বা আমার লোকেরা আর আসবে না।

॥ উনত্রিশ ॥

সনাতন এক গৃহে বার বার মাধুকরী করতেন না। দৈনিক মাত্র একটি গৃহ থেকে প্রাপ্ত ভিক্ষাই তিনি প্রভুকে নিবেদন করতেন। সেই প্রসাদ পেতেন।

একদিন তিনি মথুরা নগরে মথুরা প্রসাদ চৌবের গৃহে মাধুকরী করতে গেছেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে মন্‌মোহনিয়া মদনমোহন বিগ্রহ রয়েছেন—কিন্তু ঠাকুরের সেবায় বড় অনাচার হয়। সেবা যে হয় তাও ঠিক নয়। চৌবের ছেলেরা যখন খায় চৌবে গৃহিনী সেই সঙ্গে ঠাকুরকেও খেতে দেন। পৃথক রান্না বা ফুল-তুলসী দিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া কিছুই হয় না।

সনাতন হৃদয়ে খুব দুঃখ পেলেন। চৌবের গৃহিনীকে বললেন—মা, ঠাকুরের তেমন যত্ন হয় না।

চৌবে গৃহিনী বললেন—কি করব বাবা আমার যতটুকু সাধ্য ঠিক ততটুকু করি।

—ঠাকুরকে অনাচারে রাখ কেন ?

—আচার করতে গেলে বেলা হয়ে যায়। একা মানুষ, আমাকে সব দিক দেখতে হয় ত।

—ছেলেদের উচ্ছিষ্ট ঠাকুরকে খাওয়ায় নাকি ?

—উচ্ছিষ্ট ত নয় সব ছেলে একত্র বসে খায়।

—মদনমোহনকে আগে দিলেই ত পার।

—না বাবা তা হয় না। মনমোহনিয়া ছেলেদের ফেলে খাবে না ছেলেরাও তাকে ফেলে খাবে না। ছেলেরা শোনে না মোহনিয়াকে আগে দিলে কেড়ে খেয়ে নেয়। বাবা আমার জ্বালা কি কম ?

—আচ্ছা মা মোহনিয়ার পূজো কর না কেন ?

—সে কি গো ছেলের পূজো করে তার অকল্যাণ করব ? তুমি কি বলছ গোঁসাই ?

সনাতন স্তম্ভিত হলেন।

কথাটার ভাব তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন না। বললেন তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মা। যাই হোক ঠাকুরকে অনাচারে রেখো না। বলে সনাতন প্রস্থান করলেন।

পথে যেতে যেতে ভাবলেন, এ আবার কি ? ঠাকুরকে পূজা করতে বললে হেসে ওঠে, আচার করতে পরামর্শ দিলে, বলে পেরে উঠব না অথচ ঠাকুরকে, ভালবাসেন বুঝলুম না কি ব্যাপার।

সনাতন বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। তার দু তিন দিন পর, আবার চৌবের গৃহে উপস্থিত হলেন। রুদ্ধ দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন মা।

চৌবে গৃহিনী দরজা খুললেন। তিনি আজ সনাতনকে আহ্বান করলেন না। সনাতন বললেন মা আমায় ক্ষমা করুন। মদনমোহন কাল রাতে আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—তুই কেন আচার করতে বলে এসেছিস ? আমি ঠিক সময়ে বসে খেতে পাইনে। এ দুদিন ছেলেরাও কেঁদেছে, আমিও কেঁদেছি। আর আচারের প্রয়োজন নেই মা, তুমি যেমন রেখেছিলে তেমনি রাখ।

—আমি আজ তেমনি রেখেছি বাবা তোমার কথা শুনে দুদিন আচার করে দেখলাম ওদের কষ্ট হয়—তাই আজ লুকিয়ে একসঙ্গেই ওদের খাওয়াচ্ছিলাম। তাই তুমি এসে ডাকলে আমি আহ্বান জানাইনি যাক এবারে ভেতরে চল। ভেতরে এসে সনাতন দেখলেন—

'চোবের বালক সহ মদনমোহন,
একত্রে বসিয়া অন্ন করেন ভোজন।'

প্রেমে সনাতন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মোহনিয়ার অধরে মৃদু মধুর হাসি। দৃষ্টি অপাঙ্গ যেন আড় নয়নে সনাতনকে দেখছেন। সনাতনের চোখের জলে বসুন্ধরা প্লাবিত হলো সনাতন প্রকৃতিস্থ হয়ে চৌবে গৃহিনীকে যুক্ত করে বললেন—মা যদি দয়া করে মোহনিয়রে প্রাসাদান্ন আমায় কিছু দাও তবে আমি কৃতার্থ হই। গৃহিনী প্রসাদ দিলেন— সনাতন প্রসাদ মস্তকে ধারণ করে ভাবাবেশে নৃত্য করতে লাগলেন। নয়ন থেকে ঝর ঝর করে বারিধারা ঝরতে লাগল। চৌবে গৃহিনী বুঝতে পারলেন না তাঁর গোপাল মদনমোহননিয়ার প্রসাদ গ্রহণ করে গোঁসাই ঠাকুরের কেন ভাবান্তর উপস্থিত হলো। এ প্রসাদ ত তাঁরা নিত্য ফেলে দিয়ে থাকেন।

সমাতন প্রসাদ নিয়ে চোরের মত ছুটে পালালেন। পরদিন সকালে সনাতন আবার এসে চৌবের গৃহে দর্শন দিলেন। তাঁর বদন প্রফুল্ল কিন্তু গভীর; একটা আনন্দোচ্ছাস তাঁকে মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়ে তুলছে। তিনি দ্বারে এসে মা বলে ডাকতে না ডাকতেই দ্বার খুলে গেল। সনাতন দেখলেন চৌবে গৃহিনীর বদন বিষাদে আচ্ছন্ন। পুত্রশোকাতুরারও বদন এত ক্লিষ্ট ও কাতর দেখা যায় না। সনাতন ডাকলেন—মা।

গৃহিনী উত্তর না দিয়ে শুধু কাঁদতে লাগলেন।

সনাতন বললে—কি হয়েছে মা?

—তুমি আমার মোহিনীয়াকে নিতে এসেছ?

—হ্যাঁ মা। মদনমোহনের আদেশে তাঁকে নিতে এসেছি। স্বপ্নে আমাকে বলেছেন, তুই আমাকে নিয়ে এসে ফুলতুলসী দিয়ে পূজা কর, আমি চৌরের ঘরে আর থাকব না।

—আমাকেও তাই বলেছে। নিয়ে যাও গোঁসাই, আমি অমন ছেলের মুখ দেখতে চাইনে। না, দাঁড়াও—আমি বাছাকে ছেড়ে

কেমন করে থাকব! না গো, পারব না। তুমি আমার বাকি ছেলে কটাকে নিয়ে যাও, কিন্তু মোহিনীয়াকে নিও না। ও যে আমার বুকের কলিজা, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

—শান্ত হও মা, মদনমোহন ত তোমারই রইল; তুমি মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো।

গৃহিনীর কান্নার রেশ আরও বেড়ে উঠল। সনাতন মহাধনে লোভ করেছেন, তিনি আর বিলম্ব করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি এসে বিগ্রহ ধরলেন। চৌবে নন্দনরা কোথায় ছিল, ছুটে এসে সনাতনকে ধরল; বলল—আমাদের মোহনিয়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—আমার আশ্রমে দাদা।

কনিষ্ঠ চীৎকার করে উঠল, বলল—দেখ মা, আমার মোহনিয়া দাদাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। জননী তখন কাপড়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন। তিনি কোনও উত্তর করলেন না।

জ্যেষ্ঠ বলল—আমার মোহনিয়াকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না—আমাকে আগে মেরে ফেল তার পর নিয়ে যেও।

ছোট কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল; মুখে কেবল বুলি—ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমার দাদাকে নিয়ে যেও না।

সনাতন মহা ফাঁপরে পড়লেন; বিগ্রহ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। দেখলেন সকলেই কাঁদছে। গৃহিনীর প্রাণ যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। বড় ছেলের নয়নে আগুন ও জল; ছোট ধূলায় পড়ে চীৎকার করে কাঁদছে। সনাতন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—মোহনিয়া ত তোমাদের—আমার নয়, আমি চললাম।

সনাতন চলে গেলেন। পথে যেতে ভাবলেন আহা কি ব্যাকুলতা! একে কি প্রেম বলে? আমার কেন এমন হয় না? কি করলে কৃষ্ণ, তোমার প্রতি এমন প্রেম হয়। মদনমোহন কবে তোমায় পাব?

নিশীথে আবার স্বপ্ন দেখেন সনাতন। পরদিন সকালে মদন-

মোহনকে আশ্রমে নিয়ে এলেন। চৌবে নন্দনরা সে সময় ঘরে ছিল না, তাই তিনি আনতে পেরেছিলেন। ত্রিভুবনের নিধিকে কোলে করে চোরের মত সনাতন ছুটে পালালেন। আশ্রমে বসিয়ে চোখের জলে পা ধুইয়ে দিলেন; তুলসীর পরিবর্তে শির তাঁর চরণে দিলেন; ফুলের পরিবর্তে হৃদয়পদ্ম দিলেন। সে মদনমোহন আজও আছেন কিন্তু তাঁর সে সনাতন নেই।

রূপ দীক্ষা নিয়েছিলেন সনাতনের কাছ থেকে—আবার শ্রীজীব-দীক্ষা নিয়েছিলেন রূপের কাছ থেকে। যে বৎসর প্রভু অপ্রকট হন, সেই বৎসরই জীব কুড়ি বছর বয়েসে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে আগমন করেন। সে যুগের মহাপুরুষরা অনেকেই এমনি অল্প বয়েসে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বিশ্বরূপ, নিত্যানন্দ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ, লোকনাথ, ভূগর্ভ, এঁরা সকলেই এমনি।

একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থে রূপ-সনাতনের কাছে উপস্থিত হলেন। রূপ আর সনাতন বিচার না করেই পণ্ডিতজীকে জয়পত্র লিখে দিলেন। পণ্ডিতজী তখন ষটসন্দর্ভ প্রণেতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত জীব গোস্বামীকে খুঁজে বের করবার জন্যে রাধাকুণ্ডের ধারে এলেন।

জীব তখন যমুনায় স্নান করছিলেন। গজপৃষ্ঠ থেকে নেমে পণ্ডিতজী জীবকে অভিবাদন করে বললেন—রূপ আর সনাতন আমাকে জয়পত্র লিখে দিয়েছেন, তুমিও লিখে দাও—না হলে বিচারে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীজীব তাঁর গুরুর অপমান সহ্য করতে পারলেন না। বললেন—পণ্ডিতজী বিনা তর্কে বিনা আলোচনায় রূপ-সনাতন তোমার নিকট স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করেছেন, কিন্তু তুমি তাঁদের তুলনায় যে

কত ক্ষুদ্র তা তুমি গর্বে অন্ধ হয়ে দেখতে পাওনি। আমি তাঁদের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য মাত্র। আমি এক্ষুনি তোমার গর্ব চূর্ণ করব—বিচার সুরু কর।

বিচার সুরু হলো—অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পণ্ডিতজী পরাস্ত হয়ে পলায়ন করলেন।

রূপ একথা শুনে জীবের প্রতি কুপিত হয়ে বললেন—তুমি বৃথাই বৈষ্ণব হয়েছো, আজও মান অভিমান ত্যাগ করতে পারনি। পণ্ডিত জয়পত্র চায়, তুমি তাকে সম্মান দিয়ে নিজে কেন ছোট হলে না ?

শ্রীজীব উত্তর দিলেন—নিজের জন্য নয় গুরু নিন্দা আমি সহ্য করতে পারি নি।

রূপ সে কথা না শুনে বললেন—'আজি হইতে তব না হেরিব মুখ ?'

এই কঠোর বাক্য জীবের বুকে বজ্রের মত বাজল। তিনি গুরুর পায়ে ধরে বললেন—তবুও গুরু ক্ষমা করলেন না। তখন তিনি যমুনার তীরে বসে অনাহারে শুধু গুরুর চরণ ধ্যান করতে লাগলেন।

সনাতন সে কথা শুনলেন। দু একদিন পরে তিনি রূপকে জিজ্ঞাসা করলেন—সদাচারের মধ্যে তুমি কোনটা শ্রেষ্ঠ মনে কর ?

রূপ বললেন—জীবে দয়া।

—তবে তোমাতে তা দেখি না কেন ?

রূপ গুরুর ইংগিত পেয়ে তক্ষুণি জীবের কাছে ছুটে গেলেন। তাঁকে বুকে জড়িয়ে অনেক অশ্রুবর্ষণ করলেন।

দিনের পর দিন কাটতে থাকে। আসে সেই পুণ্য দিন—পনরো শ চৌষট্টি খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাস—পূর্ণিমা তিথি।

প্রভাতে রূপ গোস্বামী ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে এসে বসলেন। তাঁর মন আজ চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। উপাসনা বা পাঠে মন নেই। কৃষ্ণের

উপর অভিমান করে তিনি একাসনে অনাহারে বসে রইলেন। কেউ আহার না দিলে খাবেন না—মৃত্যু হয় সেও ভাল।

ভক্তের দুঃখে কাঙালের ঠাকুর বিচলিত হলেন। সন্ধ্যার কিছু আগে গ্রাম্য বালকের রূপ ধরে দুগ্ধ ভাণ্ড হাতে তিনি উপস্থিত হলেন—রূপের সামনে ভাণ্ডটি রেখে প্রস্থান করলেন দুধ আস্বাদ করে রূপ বুঝলেন তা অমৃততুল্য—অপ্রাকৃত দুগ্ধ। কে আনল জানবার জন্যে ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানে অবগত হলেন যিনি দুধ এনেছেন তিনি আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তখন রূপ গোস্বামী প্রেমে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

সনাতন এ সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন—রূপকে বহু তিরস্কার করলেন তিনি। বললেন—কেন তুমি কৃষ্ণকে দুঃখ দেবার জন্যে উপবাস করলে বল ত? তাঁর কতকষ্ট হয়! সেই সুকুমার হাতে গুরুভার ভাণ্ড নিয়ে বায়ুর চেয়েও কোমল চরণে তিনি হেঁটে এসে তোমায় দুধ দিয়ে গেছেন। সেই দুধ তোমার সেবায় লেগেছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমরা অবোধ ভক্তিহীন পদে পদে তোমায় ব্যথা দিই। এই বলে চোখের জল মুছে তিনি বললেন—শোন রূপ এরপর তুমি আর উপবাসে থাকবে না—নিজের আহার্য নিজে মাধুকরী করে সংগ্রহ করবে। না পার রঘুয়া এনে দেবে।

রূপ তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিলেন।

এমন সময় গোস্বামী রঘুনাথ দাস এসে বললেন—হ্যাঁগো, তোমরা আমার কৃষ্ণকে এই পথে যেতে দেখেছ?

রঘুনাথ অন্ধ। কৃষ্ণের জন্যে কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বনে জঙ্গলে গাছের তলায় সর্বত্র কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়ান। দেখা পান কিনা কেউ জানে না, কিন্তু অন্বেষণের বিরাম

নেই। দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র চার দণ্ড আহার নিদ্রায় অতিবাহিত করে বাকি সময় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনময় ঘুরে বেড়ান।

সনাতন বললেন—রঘুনাথ তোমার কৃষ্ণ কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিলেন।

—কই কই, আমার কৃষ্ণ কই—তিনি দিনরাত আমার সঙ্গে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন। বলে রঘুনাথ এগিয়ে এলেন।

সনাতন বললেন—তুমিই ধন্য রঘুনাথ—ত্রিলোকের নাথ দিন-রাত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এমন সময় বহুদূরে সংগীতের শব্দ শোনা গেল। যিনি গান গাইছিলেন, তিনি ক্রমে কাছে এলেন। কলেবর ভিন্ন হলেও সনাতন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিনলেন—ইনিই মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রপুরী।

সকলে প্রণাম করল। তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি গান গেয়েই চললেন। বৃন্দাবনে হরিনাম নেই, শুধু কৃষ্ণনাম। শ্রীধাম কৃষ্ণময়। বৈষ্ণবদের হৃদয় কৃষ্ণময়, পশুপাখি স্থাবর জঙ্গম কৃষ্ণময়। যে নাম গান শুনে ভক্তেরা লুটিয়ে পড়ল। সে অপূর্ব সংগীত ঝংকার তাঁদের মূর্চ্ছিত প্রায় করে দিল। ধীরে ধীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ফুটে উঠল সনাতনের দেহে।

মহাপুরুষ সনাতনকে স্পর্শ করতেই তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—সনাতন, জান কেন আমি এসেছি?

—বুঝেছি দয়াময়।

—তবে আর বিলম্ব করোনা—পূর্নিমার চাঁদ আকাশে উঠেছে। সনাতন পদ্মাসন করে যমুনাতীরে বসলেন। সব বৈষ্ণবেরা শুনলেন আজ সনাতন দেহরক্ষা করবেন। চারিদিক থেকে নরনারী ছুটে এলো দলে দলে।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী —চারিদিক শোভাময় নিস্তব্ধ।

যমুনার অপর পারে জঙ্গল। সনাতন দেখলেন তীরের ওপর একটি ক্ষুদ্রকায় কদম গাছ। ক্ষুদ্র হলেও সারাদেহ ফুলময়। সেই ফুলময়

বৃক্ষতলে সনাতন রাধা কৃষ্ণকে দণ্ডায়মান দেখলেন। শুভ্র ফুলদল তাঁদের আশেপাশে ঝুলে রয়েছে। বৃক্ষ তাঁদের মাথার ওপর ছত্র ধরেছে, একটা জ্যোতি জ্যোৎস্নাকে মলিন করে মূর্তিদুটি বেষ্টন করে রয়েছে। যমুনা ফুলে ফুলে সেই মূর্তির চরণে পড়বার জন্যে ছুটে চলেছে। আকাশের চন্দ্রতারা যেন তাঁদের চরণ নখরে ফুটে উঠেছে।

গলায় বনমালা, অধরে হাসি, নয়নে করুণা, শ্রীহস্তে মুরলী। সহসা বাঁশী বেজে উঠল। মৃদু, ধীর, করুণ। সে ধ্বনিতে কত আবেগ, কত সস্নেহ আহ্বান। সনাতন পুলকিত হয়ে বললেন—যাই, দয়াময়!

মহাপুরুষ ডাকলেন—সনাতন। দ্বাপরে তুমি কে ছিলে তা বোধ হয় ভেবে দেখনি। তুমি পুনরায় শ্রীনবমঞ্জরীর দেহ ধারণ করে ব্রজধামে নিত্যলীলা করতে থাক।

সব অন্তর্হিত হল।

সে গাছ নেই, সে মূর্তি নেই, সে বংশীধ্বনি নেই। আছে শুধু অপার, অনন্ত বিরহ।

আর শুধু প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে আজও তিনি অমলিন হয়ে আছেন—দর্শন মেলে শুধু তাঁর, নিত্যলীলায় যে প্রবেশ করতে পারে।

॥ সমাপ্ত ॥